নাগরিক ইশতেহার ২০২৬
জাতীয় নির্বাচন ও রূপান্তরের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

নাগরিক ইশতেহার ২০২৬

জাতীয় নির্বাচন ও রূপান্তরের প্রত্যাশা

খসড়া

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রকাশক

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)**

বাড়ি নং ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)

ধানমন্ডি, ঢাকা–১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২

ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮৩

ইমেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net

ওয়েবসাইট: www.bdplatform4sdgs.net

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারী, ২০২৬

স্বত্ব

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

উদ্যোগটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপের সদস্যবৃন্দ

আহ্বায়ক
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মিজ রাশেদা কে চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

জনাব আসিফ ইব্রাহিম
ভাইস চেয়ারম্যান
নিউ এজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড

মিজ শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মিজ আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
কো-অর্ডিনেটর
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

উদ্যোগের সাথে যুক্ত সিপিডির কর্মীবৃন্দ

গবেষণা ও বিশ্লেষণ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

তৌফিকুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা), সিপিডি

নাজিবা মোহাম্মদ আলতাফ, জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী, সিপিডি

মমতাজুল জান্নাত, জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী, সিপিডি

শৌর্য তালুকদার, জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী, সিপিডি

নাইমা জাহান তৃষা, গবেষণা সহযোগী, সিপিডি

আসির নেওয়াজ খান, গবেষণা সহযোগী, সিপিডি

মালিহা রহমান, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

তানবিন আলম চৌধুরী, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

মাহদিয়া মাহমুদ তাইমা, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

খাজা মাসাম ফাহিম, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

জুবায়ের জহির চৌধুরী, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

সংগঠন, সংলাপ ও প্রচার

অভ্র ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পরিচালক (সংলাপ, যোগাযোগ ও আউটরিচ), সিপিডি

তারান্নুম জিনান, নেটওয়ার্ক ফোকাল পয়েন্ট, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

মো: রিফাত বিন আওলাদ, সংলাপ সহযোগী, সিপিডি

নাহিয়ান রায়হানা প্রাপ্তি, সংলাপ সহযোগী, সিপিডি

প্রশাসন ও লজিস্টিকস

আ হ ম আশরাফুজ্জামান, যুগ্ম পরিচালক, আইটি, সিপিডি

জেরিন তাসনিম, নির্বাহী সহযোগী, সিপিডি

মায়িশা সাদিয়া, প্রোগ্রাম সহযোগী, সিপিডি

সহযোগীবৃন্দ ও সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

মূল সংগঠক

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

- অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
- ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
- ব্র্যাক
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
- সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, বাংলাদেশ
- সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
- হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশ

নেটওয়ার্ক সহযোগী

- অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ)
- অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
- অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)
- ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
- ইন্টিগ্রেটেড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট (আইএসডিই) বাংলাদেশ
- ইয়ুথ পলিসি ফোরাম
- ইয়ুথ ফর চেঞ্জ বাংলাদেশ
- এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ
- এ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারী এ্যাকশনস ফর সোসাইটি (আভাস)
- ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (সিডিএ)
- কাপেং ফাউন্ডেশন
- কারিতাস বাংলাদেশ
- গণসাক্ষরতা অভিযান
- ঘাসফুল
- জাগো ফাউন্ডেশন
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
- ডাসকো ফাউন্ডেশন
- তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা
- দলিত
- দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

- ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ)
- নাগরিক উদ্যোগ
- নারীপক্ষ
- ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
- প্রতিজ্ঞা যুব সংগঠন
- প্রত্যাশী
- ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)
- বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
- বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
- বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)
- বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)
- বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (বিএনএসকে)
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
- বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
- বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
- বাংলার চোখ
- ব্র্যাক
- ব্লু প্ল্যানেট ইনিশিয়েটিভ (বিপিআই)
- ভয়েস অব দ্য পুওর পিপল
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
- রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস)
- রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (আরআইসি)
- রূপান্তর
- লাইট হাউজ
- সাইটসেভার্স
- সাজিদা ফাউন্ডেশন
- সিবিএম গ্লোবাল ডিসেবিলিটি ইনক্লুশন বাংলাদেশ
- সিরাক-বাংলাদেশ
- সুশীলন
- সেইন্ট-বাংলাদেশ
- স্মাইল ফাউন্ডেশন
- হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন বাংলাদেশ

যুব কর্মশালার সহযোগীবৃন্দ

- অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- অর্থনীতি বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
- অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
- অর্থনীতি বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- ইকোনমিকস স্টাডি সেন্টার (ইএসসি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ইনডিপেন্ডেন্ট ইকোনমিক সোসাইটি (আইইএস), ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)
- ইয়াং ইকোনমিস্টস ফোরাম, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- ইয়াং ইকোনমিস্টস' সোসাইটি (ইয়েস), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
- উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
- ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিসিডিসি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
- নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়
- পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সাইয়েন্সেস (এফএওএসএস), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি–বাংলাদেশ (এআইইউবি)
- সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ক। অবতরণিকা ১১

খ। নাগরিক প্রত্যাশা - নতুন সরকারের প্রতি ১৩

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্র সংস্কার ১৩

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ১৪

পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্মানবোধ ১৪

বৈষম্যবিরোধিতা ও ন্যায্যতা ১৫

নিরাপত্তা ও আইনের শাসন ১৫

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন ১৬

মানবিক ও সম্মানজনক জীবনমান ১৬

মানসম্মত নাগরিক পরিষেবা ১৬

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ১৭

আঞ্চলিক উন্নয়ন ভারসাম্য ১৭

গ। যুবদের প্রত্যাশা ১৯

ঘ। আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ ২২

সুপারিশমালা প্রণয়ন পদ্ধতি ২২

নীতি বিবৃতি ১: কার্যকর ও সুশাসনভিত্তিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ২৩

নীতি বিবৃতি ২: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার পরিস্থিতির আলোকে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ২৭

নীতি বিবৃতি ৩: কৃষির বৈচিত্র্যমুখী উৎপাদনশীল রূপান্তর ৩০

নীতি বিবৃতি ৪: গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতপকরণ ৩৩

নীতি বিবৃতি ৫: গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সেবাগ্রহীতার ব্যয় হ্রাস ৩৬

নীতি বিবৃতি ৬: সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির নিশ্চয়তা ৩৮

নীতি বিবৃতি ৭: পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং দক্ষ ও সহজলভ্য সরকারি পরিষেবা ৪১

নীতি বিবৃতি ৮: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ৪৫

নীতি বিবৃতি ৯: জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাত মোকাবিলা ৪৮

নীতি বিবৃতি ১০: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইন ও বিচারব্যবস্থা ৫১

নীতি বিবৃতি ১১: জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ৫৪
নীতি বিবৃতি ১২: সক্রিয় নাগরিকতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ৫৭
ঙ । প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি ৬০
সর্বজনীন ন্যূনতম আয় ৬২
বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল ৬৪
যুব ক্রেডিট কার্ড ৬৬
জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড ৬৮
কৃষক স্মার্ট কার্ড ৭০
জাতীয় শ্রমবাজার তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্ম ৭২
কর্মজীবী নারীদের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ৭৫
নগরাঞ্চলে সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা ৭৭
সমন্বিত কর ব্যবস্থা ৭৯
জাতীয় সমন্বিত তথ্যভান্ডার ৮১
চ। উপসংহার ৮৩
ছ। পরিশিষ্ট ৮৪
১। জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কিত ৮৪
২। আঞ্চলিক পরামর্শসভাসমূহের তালিকা ৮৬
৩। যুব কর্মশালার তালিকা ৮৬

ক। অবতরণিকা

আমাদের স্মরণ আছে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জারিকৃত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। সেখানে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল—"বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে" একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। মুক্তিযুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রগঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গভীর মোড়—যেখানে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আত্মত্যাগ এবং বৈষম্যবিরোধী চেতনা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নির্মাণের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে। স্বাধীনতার পর সেই চেতনার ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য হয়ে ওঠে একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। জাতি গঠনের পাঁচ দশকের উত্থান-পতন, আশা-নিরাশার দোলাচল পেরিয়েও আমরা আজও সেই স্বপ্নের পথেই হাঁটছি।

এই সময় থেকেই নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, মানবাধিকার রক্ষায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই পথ চলায় ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান ছিল স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাঁক, যখন নাগরিক সমাজ, শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক শক্তি একত্রে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবি তোলে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের উপরি কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তন হলেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন রয়ে গেছে অসম, ভঙ্গুর এবং নানা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

বিশেষত গত দেড় দশকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়া, প্রতিষ্ঠানগত দুর্নীতি, ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন এবং নাগরিক পরিসর সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা গভীর শাসন-সংকট তৈরি করে। বৈষম্য, বঞ্চনা এবং সুশাসনের ঘাটতির এই পুঞ্জীভূত বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত সামনে আনে জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান। এটা ছিল ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে কর্তৃত্ববাদী শাসন, ভয়ভীতি ও জবাবদিহিহীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও জোরালো প্রত্যাঘাত। এই অভ্যুত্থানে উচ্চারিত হয় একটি স্পষ্ট উপলব্ধি—এটাই সময় অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের। তাই ১৯৭১, ১৯৯০ এবং ২০২৪—এই তিন সময়ের চেতনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব নেই। এ ছিল সামাজিক সুবিচার, মানবিক মর্যাদা ও বৈষম্যবিরোধী আকাঙ্ক্ষার ধারাবাহিক প্রকাশ।

আন্দোলন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং দেশের রাজনীতি রূপান্তরের এক নতুন বাঁকে উপনীত হয়। ৫ আগস্টের পর উদ্ভূত বাস্তবতা এই প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করেছে। রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার, নির্বাচন ও নাগরিক অধিকার নিয়ে আলোচনা নতুন গুরুত্ব ও তাগিদ পেয়েছে। একই সঙ্গে নাগরিক প্রত্যাশা, ভবিষ্যৎ পথচলার দিকনির্দেশনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন নিয়ে নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন। প্রশ্ন উঠছে—নির্বাচনী ইশতেহারে কি এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে? রাজনৈতিক নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা কি বাস্তবে রূপ নেবে? পরিবর্তনের আলোচনায় ও বাস্তবায়নে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে, আর কারা আবারও উপেক্ষিত থেকে যাবে?

একটি বৈষম্যবিরোধী ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে নারী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, জীবন ধারনের প্রথাগত চিন্তার বাইরের মানুষগুলো ও প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রচিন্তা ও নীতি-আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তাঁদের কণ্ঠস্বরকে স্থান দিতে হবে। এই রূপান্তরকালীন সময়ে অতীতের মতো আবার হতাশা যেন ফিরে না আসে, এবং চলমান সংস্কারের গতি যেন ব্যাহত না হয়—এই উপলব্ধি থেকেই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমাদের এই উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা, দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ৮টি আঞ্চলিক পরামর্শ সভা এবং ১৫টি যুব কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৩৫টি জেলার প্রায় ১,৫০০ জন স্থানীয় অংশীজন ও তরুণদের মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্তব্য বাক্স ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মতামত আহরণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় নাগরিক প্ল্যাটফর্মের জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের ১৫০টিরও বেশি সহযোগী সংগঠন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ, উদ্বেগ এবং ভবিষ্যৎ-ভিত্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষা শোনার ও নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

এই ধারাবাহিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই নাগরিক ইশতেহারের মূল দর্শন ও কাঠামো গড়ে উঠেছে। এটি সময়ের চেতনা ধারণ করে—বিশেষত বৈষম্য মোকাবিলা, অন্তর্ভুক্তি এবং সহাবস্থানের জাতীয় চাহিদাকে সামনে রেখে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও এই ইশতেহার বাস্তবসম্মত, প্রয়োগযোগ্য এবং নাগরিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

এই উদ্যোগের ভিত্তি রচনা করেছে নাগরিক সমাজের দুই দশকেরও বেশি সময়ের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা—২০০১ সালের সিভিল সোসাইটি টাস্কফোর্স, ২০০৬ সালের *রূপকল্প* প্রণয়ন, ২০২২ সালের বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যান ও সমান্তরাল বাস্তবতা: পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাবনা, ২০২৩ সালের সিটিজেন'স এজেন্ডা, এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র: একটি উন্নয়ন আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ (২০২৪)—এসব নীতিনির্ভর প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় বর্তমানের এই ইশতেহার প্রণীত হয়েছে। অসংখ্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পরামর্শ সভার অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে কোথায় আমাদের সীমাবদ্ধতা, আর কোথায় আমাদের শক্তি নিহিত।

নাগরিক সমাজ আজ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও পরিপক্ক ও সচেতন। এই দেশের মানুষের ভাবনার বৈচিত্র্য যেমন আমাদের শক্তি, মর্যাদা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের প্রতি অভিন্ন আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সম্মিলিত পথনির্দেশক।

এই ইশতেহার কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা নয়; বরং এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় নির্মিত জনগণের দরকষাকষির হাতিয়ার। এটি প্রতিশ্রুতির তালিকা নয়; নাগরিকদের সমৃদ্ধি, সাম্যভিত্তিক সমাজ, সহাবস্থান এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবির একটি উৎসবিন্দু—এর মাধ্যমে আগামীর সরকার, রাজনৈতিক দল এবং নীতিনির্ধারকরা জানতে পারবেন বাংলাদেশের নাগরিকরা তাঁদের কাছে কী আশা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চেতনা এবং দেশের সর্বস্তরের মুক্তবাক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে প্রণীত হয়েছে নাগরিক ইশতেহার ২০২৫-২৬। আমাদের লক্ষ্য একটাই—বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষ যেন নির্বাচনী প্রচারের ডামাডোলে হারিয়ে না যায়, এবং তরুণ, নারী, কৃষক, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক ও বিপন্ন জনগণ যেন আগামীর রাষ্ট্রগঠনে সমান অংশীদার হতে পারে।

আগামীদিনের বাংলাদেশ কেমন হবে, তার নকশা বুনেছেন নাগরিকরাই। আমরা শুধু তাঁদের কণ্ঠস্বরকে এক জায়গায় জড়ো করেছি, সব আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছি—যেখানে উচ্চারিত হয়েছে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এবং একটি মর্যাদাভিত্তিক জীবনের স্বপ্ন। এটাই নাগরিক ইশতেহারের শক্তি, এবং এটাই তার প্রতিশ্রুতি।

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম পরিচালিত বিভিন্ন আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মশালা এবং অনলাইন মতামত সংগ্রহে উঠে আসা নাগরিক প্রত্যাশা দেশের বহুমাত্রিক বাস্তবতার একটি সমকালীন প্রতিফলন। মতামতের বৈচিত্র্য থাকলেও এসব আকাঙ্ক্ষার মূল কথা প্রায় অভিন্ন—একটি ন্যায়ভিত্তিক, নিরাপদ, সুশাসিত ও সাম্যভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। নাগরিকদের এই প্রত্যাশাগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক।

এই দলিলে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ দর্শন ও আগামীর রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নাগরিকরা যে প্রত্যাশাগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন, তা উপস্থাপন করা হলো। তার সাথে যুক্ত করা হল যুবসমাজের প্রত্যয়পূর্ণ অভীপ্সা।

উল্লেখ্য, বর্তমান দলিলে প্রথমে মূল্যবোধ ও নীতিভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন তরুণ ও প্রবীণ নাগরিক। তারপর বিধৃত হয়েছে ১২টি সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক নীতি বিবৃতি। সবশেষে উত্থাপিত হয়েছে ১০টি জাতীয় নমুনা কর্মপরিকল্পনা, যা উল্লেখিত নীতি বিবৃতিকে প্রায়োগিক ভিত্তিকোন বলে আমরা মনে করি। উপরন্তু, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাগরিকরা যে সকল চিন্তা ও দুশ্চিন্তা উল্লেখ করেছেন তা-ও এই দলিলের শেষে স্থান পেয়েছে।

খ। নাগরিক প্রত্যাশা - নতুন সরকারের প্রতি

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম পরিচালিত বিভিন্ন আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, যুব কর্মশালা এবং অনলাইন মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে উঠে আসা নাগরিক প্রত্যাশাসমূহ দেশের বহুমাত্রিক বাস্তবতার একটি সমকালীন প্রতিফলন। মতামতের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এসব আকাঙ্ক্ষার মূল সুর প্রায় অভিন্ন—একটি ন্যায়ভিত্তিক, নিরাপদ, সুশাসিত ও সাম্যভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। নাগরিকদের এই প্রত্যাশাগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক।

নিচে রাষ্ট্র পরিচালনা ও আগামীর রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে নাগরিকরা যে প্রত্যাশাগুলোকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন, তা চিত্র ১-এ উপস্থাপন করা হলো। এটি একটি সমন্বিত চিত্র।

চিত্র ১: নাগরিক প্রত্যাশার সমন্বিত চিত্র

সূত্র: আটটি আঞ্চলিক পরামর্শ সভার সমন্বিত ওয়ার্ড ক্লাউডের ভিত্তিতে

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্র সংস্কার

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও দেশপ্রেমকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগত ভিত্তি হিসেবে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র সংস্কারকে সমানভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সংহতি বজায় রেখে রাষ্ট্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক ও নাগরিকবান্ধব কাঠামোয় রূপান্তর করতে হবে।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণমুখী রাখতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মর্যাদা সুসংহত হয়।

- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ রেখে উন্নয়ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।
- প্রান্তিক ও ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চকক্ষ বা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সম্ভাব্য কাঠামো নিয়ে জনআলোচনা ও নীতি উদ্যোগ নিতে হবে, যেখানে হিজড়া, দলিত/হরিজনসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।
- রাষ্ট্রীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, ভূমিকা, ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য সাংবিধানিকভাবে স্পষ্ট করতে হবে, যাতে নির্বাহী আধিপত্য ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমে।
- জাতীয় স্বার্থ, নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আচরণ রক্ষায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা

রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে পেশাদারিত্ব, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জনমতের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

- সংবিধানে নির্ধারিত ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং তাকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও ক্ষমতাবান করতে হবে।
- সরকারি ও উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য মাসভিত্তিকভাবে একটি উন্মুক্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করতে হবে।
- সব সরকারি দপ্তরের নথি ও ফাইল ব্যবস্থাপনা ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন করতে হবে।
- সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের হিসাব দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই এবং পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদক এর সঠিকতা যাচাই করবে।
- জাতীয় বাজেটের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারের বাজেট ও ব্যয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপকারভোগী তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।
- নাগরিকদের অভিযোগ, মতামত ও সেবা-সংক্রান্ত সমস্যা জানানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় জবাবদিহিতা পোর্টাল চালু করতে হবে।
- কর্পোরেট খাতে জবাবদিহিতা এবং এনজিও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্মানবোধ

গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনর্গঠনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মানবোধকে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি করতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক মতভেদ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যেন সহিংসতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষে রূপ না নেয়—সে জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ন্যূনতম মানদণ্ড স্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও মান্য করতে হবে।

বাক-স্বাধীনতা এবং মত ও দ্বিমত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাগরিক শক্তি ও অংশগ্রহণ বাড়াতে নাগরিক পরিসরকে নিরাপদ, উন্মুক্ত ও সংকোচনমুক্ত রাখতে হবে।

- সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা রক্ষায় কার্যকর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো সংবাদমাধ্যম প্রশাসনিক আদেশ, রাজনৈতিক চাপ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত না হয়।
- সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পেশাগত মানদণ্ড, স্বীকৃতি ও জবাবদিহিতার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে ভুয়া পরিচয়, অপেশাদার আচরণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যপ্রচারের সুযোগ কমে।
- ডিজিটাল পরিসরে বিভ্রান্তিমূলক ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাইবার বুলিংয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় থাকে।
- শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বাউল, সুফি, সাধক এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাধীন সাংস্কৃতিক প্রকাশ নিশ্চিত করতে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এনজিও ও নাগরিক সংগঠনগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নাগরিক পরিসর সংকুচিত না হয়।

বৈষম্যবিরোধিতা ও ন্যায্যতা

রাষ্ট্রচিন্তা, আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণের প্রতিটি স্তরে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন প্রতিফলিত করতে হবে। বৈষম্যকে একটি কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তার আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নকে রাষ্ট্রীয় নীতি ও বাজেট প্রণয়নের কেন্দ্রে রাখতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক ও জেন্ডারভিত্তিক সমতা নিশ্চিত করতে হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে সেবা ও সুযোগপ্রাপ্তির কাঠামোগত বাধা দূর করতে হবে।

- একটি কার্যকর বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীন, সক্ষম ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী কৃষকদের 'নারী কৃষক' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কৃষি সহায়তা ও প্রণোদনায় তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভোটার নিবন্ধন, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষায় পূর্ণ, বৈষম্যহীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থবহ ও সম্মানজনক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসনসহ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে।
- প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি বয়সভিত্তিক বৈষম্য দূর করে রাষ্ট্রীয় সেবা, বিচার ও সামাজিক পরিসরে মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে আইনগত ও সামাজিক বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।
- পথশিশু ও বস্তিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- গৃহকর্মী, অনানুষ্ঠানিক ও অবৈতনিক পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত নারীদের শ্রমের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- যৌনকর্মীসহ সামাজিকভাবে প্রান্তিক পেশায় নিয়োজিত নাগরিকদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তা ও আইনের শাসন

ব্যক্তি ও ও জনপরিসরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং পেশাদার ও নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে হবে।

ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও নাগরিক সুরক্ষার জন্য সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ডিজিটাল পরিসর নিরাপদ থাকে এবং অপরাধ দমন কার্যকর হয়।

- পরিচয়, পেশা বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সমান ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি বন্ধে কার্যকর সংস্কার নিতে হবে।
- নারী, শিশু, সংখ্যালঘু, লিঙ্গ-বৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন ও নগর পর্যায়ে সড়ক ও জনপরিসরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর স্ট্রিট লাইটিং ও সিসিটিভি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- কিশোর গ্যাং সহিংসতা প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক সামাজিক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- পার্বত্য, দুর্গম ও চরাঞ্চলে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করতে হবে এবং জরুরি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সেবার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন

নাগরিকদের আস্থা পুনর্গঠনের জন্য দুর্নীতিবিরোধী আইন ও নীতিমালা কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে জবাবদিহিতা দৃশ্যমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে, আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা জোরদার করতে হবে এবং বাজারে প্রবেশ ও কার্যক্রমে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে বাজার ও সেবাখাতে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

- সরকারি নিয়োগ ও পদোন্নতিতে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি কার্যকর করতে হবে।
- রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুর্নীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ও প্রকাশ্য শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না থাকে।
- সরকারি হাসপাতাল ও সেবাখাতে সিন্ডিকেট চক্র বন্ধ করতে হবে এবং সেবা প্রদানে ঘুষ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কর ফাঁকি ও আর্থিক খাতের অনিয়ম রোধে কার্যকর নজরদারি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- ক্ষুদ্র ঋণ খাতে সুদের হার ন্যায্য পর্যায়ে রাখতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদার করতে হবে।
- ডেইরি ফার্ম, কৃষি বিপণন ও স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চাঁদাবাজি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করতে হবে।

মানবিক ও সম্মানজনক জীবনমান

মানবিক মর্যাদাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে মানবিক ও সম্মানজনক জীবনমান নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শোভন কর্মসংস্থান, ন্যূনতম আয় এবং কার্যকর সামাজিক সুরক্ষাকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জীবনচক্রভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবিলায় এমন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কেউ পিছিয়ে না পড়ে।

- শিক্ষাব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের সংযোগ জোরদার করতে কারিগরি ও ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ সরাসরি কর্মসংস্থানে রূপ নেয়।
- গ্রামীণ, দুর্গম ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রণোদনা বৃদ্ধি, ল্যাব সুবিধা সম্প্রসারণ এবং টেলিমেডিসিন সেবা চালু করতে হবে।
- প্রতিটি নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বা স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে।
- মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং এ খাতে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তুলতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক পুনর্বহাল করতে হবে।
- প্রবাসী ও প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সনদ, নিয়মিত খোঁজখবর, আইনি সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

মানসম্মত নাগরিক পরিষেবা

নাগরিক পরিষেবাকে নির্ভরযোগ্য, মানসম্মত, সহজলভ্য ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। পরিবহন ও যোগাযোগ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশন, নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো এবং ডিজিটাল ও প্রশাসনিক সেবার মান উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে নাগরিকরা হয়রানি ছাড়া সেবা পান।

- বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেট, পরিবহন ও নগর সেবার নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায়।
- সরকারি সেবা—জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও সামাজিক সুরক্ষা—ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কার্যকরভাবে ডিজিটালাইজেশন করতে হবে।
- প্রতিটি নাগরিক সেবার জন্য সেবা পাওয়ার মানদণ্ড, সময়সীমা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।
- দুর্গম, চর ও প্রান্তিক অঞ্চলে সরকারি সেবার ভৌত উপস্থিতি এবং মোবাইল ও ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে।
- কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অবকাঠামো, সেচ, কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার, বাজারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে।
- দেশব্যাপী মাল্টি-মোডাল যোগাযোগসহ গণপরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করতে হবে, যাতে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চলাচল নিশ্চিত হয়।
- নগর জনপরিসরে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত অবকাঠামো ও সেবাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি, পানি, বন ও নগর ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু-সংবেদনশীল নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে জীবন, জীবিকা ও পরিবেশ একসঙ্গে সুরক্ষিত থাকে। কৃষিনির্ভরতা থেকে বহুমাত্রিক জীবিকার দিকে রূপান্তরকে আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

- বরেন্দ্র ও উত্তরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে।
- তিস্তা ও অন্যান্য আন্তঃদেশীয় নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে।
- উপকূলীয় কৃষক ও জেলেদের জন্য জলবায়ু বীমা ও অভিযোজন সহায়তা চালু করতে হবে।
- কাপ্তাই হ্রদ ও সংশ্লিষ্ট ওয়াটারশেড সংরক্ষণে সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সবুজ নগরায়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ও জলাধার সংরক্ষণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নির্বিচারে বৃক্ষনিধন বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিতে হবে।
- পদ্মা নদীসহ প্রধান নদ-নদীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন ভারসাম্য

টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও কাঠামোগত বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে লক্ষ্যভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একক উন্নয়ন মডেলের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক সম্পদ, ঝুঁকি, জীবিকাগত নির্ভরতা ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

- ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমি কমিশন কার্যকর করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতায়ন করতে হবে।
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও স্থানীয় আয়ের উৎসভিত্তিক উন্নয়নের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সাথে এ এলাকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

রংপুর অঞ্চল

- খরা ও তিস্তা-নির্ভর বাস্তবতা বিবেচনায় কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হবে। একই সঙ্গে পরিস্থিতির আলোকে নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে দ্বিতীয় গঙ্গা ব্যারাজসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বরেন্দ্র অঞ্চল

- পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ও পানিনির্ভর শিল্প উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে।
- রাজশাহী সিল্কসহ ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুনরুজ্জীবন করতে হবে।

খুলনা-বরিশাল অঞ্চল

- লবণাক্ততা ও দুর্যোগ-প্রবণতা বিবেচনায় পৃথক উন্নয়ন কৌশল নিতে হবে।
- ভোলার গ্যাস ব্যবহার করে শিল্পায়ন ও নৌ-পর্যটন সম্প্রসারণ করতে হবে।

নদীভাঙন ও হাওর অঞ্চল

- পুনর্বাসন, বিকল্প জীবিকা ও বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে।

এই প্রত্যাশাগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর সংস্কার উদ্যোগ এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার ওপর। নাগরিকরা মনে করেন, এসব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একটি ন্যায়ভিত্তিক, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে কার্যকর মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।

গ। যুবদের প্রত্যাশা

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে আয়োজিত যুব কর্মশালার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য তাদের সুস্পষ্ট দাবি ও অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছে। এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় যুবসমাজ একটি দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক ও জনগণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেছে—যেখানে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা, দক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি কেবল নীতিগত অঙ্গীকার নয়, বরং বাস্তবায়নযোগ্য রাষ্ট্রীয় দায় হিসেবে স্বীকৃত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে যুবসমাজ যে বিষয়গুলোকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে, তা নিচে চিত্র–২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত চিত্র।

চিত্র ২: যুব অগ্রাধিকারের সারসংক্ষেপ

সূত্র: ১৫টি যুব কর্মশালার সমন্বিত ওয়ার্ড ক্লাউডের ভিত্তিতে

যুবসমাজ মনে করে, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সততা, ন্যায্য আচরণ, নিরপেক্ষতা এবং সুসংহত নৈতিক মানদণ্ড বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এসব মৌলিক সংস্কার নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা, সামাজিক আস্থা এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল উন্নয়ন গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

১) **নির্বাচনী সংস্কার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক ঐক্য ও আস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

২) **বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিরোধী** আইন সংশোধন করতে হবে এবং গঠনমূলক সমালোচনার জন্য ভয়হীন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিভিত্তিক সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে** সরকারি আয়, ব্যয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং সুবিধাসহ একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল পোর্টাল বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে।

৪) **স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য** কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন, রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও ডিজিটাল স্বচ্ছতা-নির্ভর স্বাধীন দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা গঠন করতে হবে।

৫) **আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে** বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে; পাশাপাশি বিচারিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্যে ই-জুডিশিয়ারি ও ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন **ন্যায়পাল (Ombudsman)** নিয়োগ করতে হবে।

৬) **জাতীয় ঐক্য ও ভবিষ্যৎমুখী শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ গঠনের পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণতা গড়ে তোলার জন্য** একটি ট্রুথ ও রিকনশিলেশন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭) **নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের উপর জনআস্থা ফিরিয়ে আনতে** পুলিশসহ সকল নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নিরপেক্ষ তদারকি ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ টাস্ক-ফোর্স গঠন করতে হবে।

৮) **নারীদের নিরাপত্তা, অধিকার ও সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের লক্ষ্যে** কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থা, ২৪/৭ নিরাপত্তা অ্যাপ, নিরাপদ পরিবহন ও ওয়ান-স্টপ নিরাপত্তা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। সাইবার বুলিং রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও অভিযোগকারীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে ও সার্বক্ষণিক (২৪/৭) কেন্দ্রীয় মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন চালু করতে হবে।

৯) **সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে** প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক ও দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, **শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে যৌন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে** যাতে শিক্ষার্থীরা সচেতন, দক্ষ ও সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১০) **রাজনৈতিক সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে জাতীয় শিক্ষাক্রমে** নাগরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে সহনশীল, দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক গড়ে উঠে।

১১) **কারিগরি, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে** চাকরি ও শিক্ষার সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। যুবদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এবং 'ইয়ুথ প্রসেসিং জোন' তৈরি করতে হবে।

১২) **স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি রোধে** স্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া এবং ন্যায্য ও সুষম ওষুধ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩) **কার্যকর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে** স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করা, বাজেটের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে আধুনিক নাগরিক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। সেই সঙ্গে জনভোগান্তি নিরসনে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত ও কার্যকর একটি ডিজিটাল জবাবদিহি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৪) **উপকূলীয় ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য** টেকসই জীবিকা, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

তুলনামূলক বিচার

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত আঞ্চলিক পরামর্শসভা ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী কর্মশালাগুলোতে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, পরিচয় ও জীবিকাভিত্তিক গোষ্ঠীর মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে নিরাপত্তাহীনতা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার একটি সুস্পষ্ট ও অভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, আত্মপরিচয় ও জীবিকা, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং রাজনৈতিক প্রান্তিকতা—এই বিষয়গুলো মানুষের অনিরাপত্তার অভিজ্ঞতাকে অঞ্চল ও পরিচয়ভেদে ভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করছে। ফলে একক বা সর্বজনীন সমাধানের পরিবর্তে *প্রেক্ষিতভিত্তিক* ও *লক্ষ্যনির্দিষ্ট* উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে উঠে এসেছে।

সব অঞ্চলে *জীবিকাগত অনিরাপত্তা* ছিল নাগরিক উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু। কর্মসংস্থান, ন্যায্য আয়, সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলার সক্ষমতাকে অংশগ্রহণকারীরা অস্তিত্বগত সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক জবাবদিহিতার ঘাটতি নিয়ে গভীর আশঙ্কা যুক্ত ছিল—বিশেষ করে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়ার অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা নাগরিক আস্থাকে দুর্বল করেছে।

পরামর্শসভাগুলোতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর *আস্থার সংকট* একটি প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিচারব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেকেই দূরবর্তী, জবাবদিহিহীন কিংবা বাছাইকৃতভাবে

সাড়া প্রদানকারী হিসেবে দেখেছেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাস নাগরিকদের অনিরাপত্তাবোধ বাড়িয়েছে এবং মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সীমিত করেছে।

নির্বাচনসংক্রান্ত উদ্বেগ ছিল আলোচনার অন্যতম কেন্দ্র। অংশগ্রহণকারীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা, নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; পাশাপাশি ভয়ভীতি, নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা এবং রাজনৈতিক প্রতিশোধের আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। এসব উদ্বেগ একটি বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে।

রাজনৈতিক দল ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ড, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, ব্যক্তিগত আচরণ এবং নাগরিক সমস্যার সমাধানে তাদের ভূমিকার জন্য জবাবদিহির আওতায় আনার সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন দাবি উঠে এসেছে। জাতীয় রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও, মানুষের কাছে তাদের তাৎক্ষণিক *স্থানীয় বাস্তবতা ও দৈনন্দিন ঝুঁকিই* ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ—যা জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনার প্রতিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করেছে।

সাধারণ সমস্যার ভেতরেও লিঙ্গ, বয়স, পেশা, আত্মপরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে বিশেষ চাহিদা আছে। সর্বজনীন ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁরা বিশেষ মনোযোগ ও পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে। ছোট ভৌগলিক এলাকার মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান ও এলাকাভিত্তিক বিশেষ দাবী দৃশ্যমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবায়নকে শান্তি, উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থার বৈধতা পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে এই এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারেও জোড় দেওয়া হয়। সব জাতিগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে ঐকমত্য থাকলেও, বাস্তবায়নের পথ ও প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্নমত বিদ্যমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী কর্মশালাগুলোতে যুবদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘমেয়াদি ও ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। তারা নির্বাচনী চক্রের বাইরেও কাঠামোগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল—যা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তনের সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। সর্বোপরি যুব সম্প্রদায় শোভন ও টেকসই কর্মসংস্থান ও মানসম্পন্ন শিক্ষাকে তাদের প্রাধিকারের উচ্চ অবস্থানে ছিল।

সবশেষে, সব অঞ্চলে একটি অভিন্ন বার্তা স্পষ্ট হয়েছে: মানুষ উদ্বিগ্ন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁরা নিরাপদ নাগরিক পরিসর চান যেখানে ভয় ও সংশয় ছাড়া মত প্রকাশ, সংগঠিত হওয়া এবং অংশগ্রহণ সম্ভব। তারা এমন নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেন যা বিশ্বাসযোগ্য, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিকদের মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও নিরাপদ জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করে—যাতে উন্নয়নের নামে কেউ পিছিয়ে না পড়ে।

ঘ। আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি-সুপারিশ

সুপারিশমালা প্রণয়ন পদ্ধতি

একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে হলে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এ অভিষ্টকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন হবে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, এবং সর্বস্তরে জবাবদিহিতার সংস্কৃতির প্রচলন। এ ধরণের একটি সমাজ বিনির্মানে নাগরিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ভূমিকার একটি অন্যতম অনুঘটক ও অনুষঙ্গ হল নাগরিকদের প্রত্যাশাগুলি কি তা যুক্তিসঙ্গত ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে নীতিনির্ধারকদের ওপর সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত সরকার ও জনপ্রতিনিধিরা জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যেহেতু দায়বদ্ধ, সেহেতু এসব দাবী তাদের কাছে উত্থাপন করা নাগরিক দায়িত্বও বটে। এ দায়বদ্ধতার নিরীখে ও এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক প্রণীত *নাগরিক ইশতেহার* এর অংশ হিসাবে নির্বাচিত কয়েকটি খাত ও ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ ও সুপারিশ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত এসব কর্মসূচী সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকার এবং এস.ডি.জি.-র *কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না* এ প্রত্যয়ে প্রাণিত। একই সাথে এসব প্রস্তাব জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকেও ধারণ করে।

নাগরিক প্লাটফর্ম বিগত সময়ে তার ১৫০টিরও অধিক সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে ও তাদের সক্রিয় সমর্থনে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগণের কণ্ঠকে উচ্চকিত করার জন্য ও মূলধারার অর্থনীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ধারাবাহিকভাবে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে এসব সুপারিশ তারই প্রতিফলন।

স্মর্তব্য যে, নাগরিক প্লাটফর্মের উদ্যোগে বাংলাদেশের তৎকালীন বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরীখে ২০২২ সালে *সমান্তরাল বাস্তবতা* শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল যে প্রতিবেদন তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের বহুল প্রচলিত উন্নয়ন বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ ও চ্যালেঞ্জ করে, এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকার কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরে। পরবর্তীতে এ সমান্তরাল বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুষমবন্টনভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মানের লক্ষ্যে এবং বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আশা-আকাংখাকে ধারণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের জন্য প্লাটফর্ম একটি কর্মসূচী হাতে নেয়। এ কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে পলিসি ব্রীফ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১টি বিশেষজ্ঞ টিম গঠন করা হয়। এসব বিশেষজ্ঞ টিমের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ২০২৩ সালে ১১টি পলিসি ব্রীফ প্রস্তুত করা হয়।

২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরবর্তীতে এবং জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম *নাগরিক ইশতেহার হার* প্রণয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর অংশ হিসাবে ২০২৫ সালব্যাপী ৮টি বিভাগীয় শহরের স্থানীয় সুধীজন ও ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের নিরীখে উল্লেখিত পলিসি ব্রীফের সুপারিশসমূহকে পর্যালোচনা করা হয় এবং অগ্রাধিকার পূণর্মূল্যায়নের মাধ্যমে এগুলির পুণর্লিখন করা হয়। একই সাথে নাগরিক প্লাটফর্মের বিভিন্ন সদস্য-সংগঠনসমূহের পরামর্শ ও সুপারিশও এগুলিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নাগরিক ইশতেহার এর বর্তমান অংশের অন্তর্ভুক্ত ১২ টি নীতি-বিবৃতিতে খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও সুপারিশমালা এ প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। এসব সুপারিশ থেকে নির্বাচিত কিছু সুপারিশ নিয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি কি হতে পারে, নাগরিক ইশ্তেহারের তৃতীয় অংশে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নীতি বিবৃতি ১: কার্যকর ও সুশাসনভিত্তিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দাঁড়প্রান্তে অপেক্ষামান বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিক পুঞ্জীভূত সমস্যা কাটিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে হবে, এবং এ স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে, যে প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আয়, ভোগ ও সম্পদের বন্টনের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে একটি জনকল্যানমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে ভালো অর্থনীতি ভালো রাজনীতিও বটে পার্লামেন্টারী স্টান্ডিং কমিটিসমূহের কাজ এ অনুধাবনে অণুপ্রাণিত হতে হবে।

বাংলাদেশকে একটি জনকল্যানমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রাভীমুখী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে, সুশাসন-নির্ভর উন্নয়ন প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং জবাবদিহিতাসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা ও সংস্কারকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে রূপ দিতে হবে, এসব কর্মসূচীর বাস্তবায়নে লক্ষ্যনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সেসব পদক্ষেপের বাস্তবায়নে জবাবদিহিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশকে এমন একটি অর্থনীতি বিনির্মান করতে হবে যেখানে বিনিয়োগ হবে প্রতিবন্ধকতা মুক্ত, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহোরণ হবে অর্থনীতির সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে শক্তিশালী অবস্থান থেকে। এসব লক্ষ্য অর্জনে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

সংসদীয় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

- সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে জাতীয় সংসদে প্রতি প্রান্তিকে অর্থমন্ত্রীর প্রতিবেদন দাখিলের যে সিদ্ধান্ত আছে, তা কার্যকর করতে হবে।
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-সংশ্লিষ্ট পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কর্মকান্ডে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এ সব কমিটির কার্যকলাপ নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন

- বর্তমানে বাংলাদেশে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেই। সমন্বিত, পরিকল্পিত ও যথাযথ অর্থায়ন-নির্ভর মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে নবনির্বাচিত সরকারকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- অর্থনীতির বর্তমান সমস্যাবলী ও তার সমাধানের আলোকে একটি দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যা নবম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

মানসম্মত তথ্য-উপাত্তের সৃজন

- দক্ষ ও মানসম্পন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল পূর্বশর্ত সঠিক, নির্ভরযোগ্য, মানসম্পন্ন ও হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত যা নীতিনির্ধারকদের কাছে অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে।
- এ লক্ষ্যে বি.বি.এস. এর প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্বশাসন যেমন জরুরী তেমনি স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনের নিশ্চয়তা ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্বেতাপত্র, টাস্কফোর্স ও বি.বি.এস.-এর সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নীতি-বিশ্লেষক, গবেষক ও মিডিয়াসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের সরকারী তথ্য-উপাত্তের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

দক্ষ উন্নয়ন প্রশাসন

- উন্নয়ন কর্মকান্ডের উৎকর্ষতা একটি দক্ষ সৎ ও কার্যকর প্রশাসনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ অনুধাবনে প্রণিত হয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পেশাদারী সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- সেবাপ্রদানকারী সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে সেবাগ্রহীতাদের কাছে জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধানে একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- উন্নয়ন প্রশাসনের সকল পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূণ্য সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। এ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় এ.সি.সি.কে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

বিনিয়োগ ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য প্রদান

- ব্যবসা পরিবেশের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ-ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাস এর লক্ষ্যে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতির পরীবিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতার ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করতে হবে।
- বেসরকারী খাতে বিনিয়োগকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে, ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের মূল চালিকাশক্তি হবে দক্ষ ও শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জনশক্তি ও পেশাদারীত্ব ও সুশাসন-ভিত্তিক বিনিয়োগ বান্ধব উন্নয়ন প্রশাসন।

সরকারী ব্যয়ে দক্ষতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান

- সরকারী ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধানে সরকারী ক্রয়, বিনিয়োগ, বিনিয়োগে অগ্রগতি, টেন্ডার, অর্থব্যয়, প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-প্রাপ্তিতে আর.টি.আই. প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার বিধানসমূহ বাতিল করতে হবে।
- সরকারী ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও ব্যয়ের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিভিউ কমিশন' গঠন করতে হবে।

রাজস্ব স্পেস এর সম্প্রসারণ

- রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের লক্ষ্য হবে দ্বিবিধঃ সরকার প্রাপ্ত রাজস্ব-জিডিপি হার ও জনগণ প্রদত্ত রাজস্ব—জিডিপি হার এর মধ্যে পার্থক্য শুণ্যে নামিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয়-জিডিপি-র হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি যাতে আগামী পাঁচ বছরে এ হার দক্ষিণ এশিয়ার গড় হারের সমপর্যায়ে (১৪-১৫%) উন্নিত করা সম্ভব হয়।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা বিধানে এন.বি.আর এর যেসব সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে সেগুলির বাস্তবায়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের ভিত্তিতে এ খাত তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
- সরকারী মালিকানায় যেসব প্রতিষ্ঠান (এস.ও.ই.) আছে সেগুলির কার্যক্রম, অর্থায়ন আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক লভ্যতা ও সামাজিক উপযোগীতার নিরীখে এগুলোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- রাজস্ব আহরণের সকল পর্যায়ে প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে সমন্বিতভাবে তথ্য আহোরণ সম্ভব হয়, কর প্রদান সহজতর হয় এবং ব্যয় ও আয়ের সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে কর ফাঁকি দূর করা যায়।
- একটি নির্দিষ্ট সীমানার ওপরে সকল ব্যয়ে এন.আই.ডি. নম্বর দিতে হবে যা আয়কর নম্বরের সাথে লিংক করা থাকবে।
- মোট করে আয়কর এর অংশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রন ও ক্রয়সক্ষমতা সংরক্ষণ

- উন্নতর বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উৎপাদন, সরবারাহ, আমদানী, সরকারী ক্রয়, স্টক ও খোলাবাজারে বিক্রিসহ সকল পর্যায়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সমন্বিত ও হালনাগাদকৃত তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য-অভিগম্যতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং এক্ষেত্রে সংসদীয় নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে। মজুরী ও বেতন কমিশন গঠনের অন্তবর্তী সময়ে মূল্যস্ফীতির হারের নিরীখে বেতন ও মজুরীর সমন্বয় করতে হবে।

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা

- ঋণের শর্ত ক্রমান্বয়ে কঠিন হওয়া ও ঋণের সুদ হারের বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ঋণ আলোচনায় দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উৎকর্ষতা বিধানে উদ্যোগ নিতে হবে এবং বিশেষতঃ কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহনের পূর্বশর্তসমূহ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
- বৈদেশিক ঋণ-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাদ্দিহিতার ভিত্তিতে করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অর্থায়ন, আর্থিক ও ফাইনান্সিয়াল রিটার্নের হিসাবসহ প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে।
- বাংলাদেশ যাতে কোন প্রকারেই ঋণ-ফাঁদে আটকে না পড়ে সেজন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিষেবার দায়ভার নিয়ে নিয়মিত পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

সুশাসিত আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা

- অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশেষত ব্যাংকিং ও শেয়ার মার্কেট সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যে কোন ধরণের সংশ্লিষ্টতা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- ব্যাংকিং খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনভাবে কার্যক্রমের নিশ্চয়তা বিধান, ব্যাংকসমূহের বোর্ড গঠন ইত্যাদিসহ ইতোমধ্যে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচী সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে স্ব স্ব ইশ্তেহারে এ সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে হবে।
- নির্বাচিত সরকারকে পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার, খেলাপী ঋণ আদায়সহ অন্তবর্তীকালীন সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহত রাখতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত তথ্য জনসম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে।
- 'ব্যাংক কমিশন' গঠন করে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং নবনির্বাচিত সরকারকে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কি কি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন

- সকল পর্যায়ে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি ও জীবন-চর্চাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে জনসচেনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কর্মকান্ডকে অনুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের মান্যতা লংঘনকারী সকল ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- বৈশ্বিক বিভিন্ন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধানে বাংলাদেশকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে টেকসই উত্তরণ

- নবনির্বাচিত সরকারকে এল.ডি.সি উত্তরণ বিলম্বের জন্য আবেদন করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- লক্ষ্যনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ যেসব সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী 'স্মুথ ট্রানজিশান স্ট্রাটেজী'তে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য নবনির্বাচিত সরকারকে একটি কাঠামো দাঁড় করাতে হবে।
- বাজার বৈচিত্রকরণ, পণ্য বৈচিত্রকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শ্রম ও পুঁজির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার-সুবিধা বিলুপ্তি-পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।
- দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগীতাকে গভীরতর করার লক্ষ্যে এ সম্বন্ধীয় আলোচনা পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে এবং এ লক্ষ্যে অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত 'নেগোশিয়েশন পুল' এর যথাযথ প্রশিক্ষণে ও প্রস্তুতিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদ্যমান ও আগামীর বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবেলা করে স্বল্পোন্নত দেশ (এল.ডি.সি.) থেকে উত্তরণকে টেকসই করতে হলে ও একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হতে হলে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মান এসব আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সার্বিক কাঠামোগত রূপান্তর নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন আর্থিক খাতে সুশাসন ভিত্তিক পরিচালন, রাজস্বখাতে প্রযুক্তিনির্ভর প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতের আধুনিকায়ন, শিল্পখাতের বৈচিত্রায়ন, রপ্তানিখাতের প্রতিযোগীতাসক্ষমতা ও বৈচিত্রায়, কর্ম ও স্বকর্ম সৃজন, বন্টনের ন্যায্যতা, পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন এবং শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি। আর এ সব কিছু নির্ভর করবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কার্যকারীতা ও উৎকর্ষতার ওপর।

নীতি বিবৃতি ২: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার পরিস্থিতির আলোকে যুবদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

বাংলাদেশের যুবসমাজ দেশের শ্রমবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিশাল শক্তি যা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি, একবিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবনী অর্থনীতি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জনকল্যানমুখী রাষ্ট্র বিনির্মানে নিয়ামক ভূমিকা রাখবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যুবরা কি তাদের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরীখে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে? তারুণ্যের শক্তিকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃষ্টভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যনির্দিষ্ট উদ্যোগ-উদ্যম কি পরিলক্ষিত হচ্ছে? এসবের উত্তর এক কথায় বললে, না, হচ্ছে না। আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশের জনমিতিক লভ্যতা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) সুযোগের জানালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আমরা তা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারি। প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কর্মসুযোগ-এর ত্রিমাত্রিক সংযোগে যুবসমাজের সম্ভাবনা ও প্রতিভা, উদ্ভাবন ও উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি, সীমিত সামাজিক সুরক্ষা এবং অনিশ্চিত কাজের পরিবেশ সমস্যাটিকে আরও জটিল করছে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, যেখানে শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত এবং এ ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যও বিদ্যমান। শ্রমবাজারের দক্ষতার চাহিদা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। যুবদের এ পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রেক্ষাপটে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ ও সম্মানজনক শ্রমবাজার গড়ে তুলতে তরুণদের জন্য শোভন কর্মসৃজন এখন সময়ের দাবী।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন

- শ্রমবাজারে কোন্ সুনির্দিষ্ট দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে বা কমছে তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য শিল্প–প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে এবং দক্ষতার তালিকা হালনাগাদ করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্প–সম্পৃক্ত ও সময়োপযোগী পাঠ্যসূচি চালু করতে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে উপযুক্ত প্রণোদনার মাধ্যমে নিয়মিত মতবিনিময়, ইন্টার্নশিপ এবং চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত কর্মমুখী শিক্ষা (Co-op) মডেল চালু করতে হবে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (TVET)–এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, এবং প্রাক–যোগ্যতা না থাকার কারণে এ ধরণের শিক্ষায় ভর্তি হতে না-পারা যুবকদের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি চালু করে বিশ্বব্যাংক সমর্থিত (ইএআরএন) চলমান উদ্যোগগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।
- প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দক্ষতা অর্জন থেকে কর্ম নিয়োজন- একটি বাস্তবমুখী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়োগকর্তাদের শিক্ষানবিশ সুযোগ প্রদানে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে যুবদের শ্রমনিয়োজনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অভিবাসন সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

- অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রেরণকারী ও নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে।
- চাকরিদাতা দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য চুক্তি, আইনি সুরক্ষা এবং ন্যায়সংগত আচরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- বিএমইটিকে প্রধান অভিবাসী দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য কর্মীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা করতে হবে এবং শ্রমবাজার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নিয়মিত জরিপ চালিয়ে বিদেশে চাকরির বাজারের অবস্থা ও চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে।

- অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পুনর্গঠন পূর্বক সমাজকল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- প্রধান অভিবাসী শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে 'অভিবাসী শ্রমিক তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র' স্থাপন করতে হবে এবং বিদেশে কাজ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীতে শ্রমিকদের তথ্য-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ডিজিটাল ব্যবসা শনাক্তকরণ (ডিবিআই) সহ প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ নম্বর প্রদান করতে হবে এবং ব্যবসা নিবন্ধনের সুবিধা ও প্রয়জনীয়তা সম্বন্ধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।
- ক্রমান্বয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের অংশগ্রহণকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের সুবিধা প্রদান করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি

- স্বকর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নতুন উদ্যোক্তাদের অনুদান ও ইক্যুইটি সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় উদ্যোক্তা তহবিল গঠনের যে ইতিবাচক উদ্যোগ ইতমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে কার্যকর করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উদ্ভাবন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নতুন উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা কাজে লাগানোর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আইসিটি ও উচ্চ-প্রযুক্তি খাত উন্নয়ন

- সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- ভবিষ্যতের বাজারের জন্য কর্মশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কোডিং ও ডিজিটাল সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমশক্তিতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস

- নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হাতে নিতে হবে, এবং প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
- পরিবারবান্ধব শ্রম নীতি কার্যকর করতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে কর্মজীবি মহিলারা শ্রমবাজারে নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- যেসব খাতে মূলত পুরুষরাই এখন কাজ করেন এমন সব খাতসহ সব ক্ষেত্রে নারীদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যুব নারীদের বৃত্তি, আবাসিক সুবিধা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধে আইনের সক্রিয় প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, হিজড়া ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য বিশেষায়িত ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট শ্রম-নিয়োজন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।
- প্রতি উপজেলা এলাকায় নারীদের জন্য সেলাই, হস্তশিল্প ও আইটি বিষয়ক বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শোভন পরিবেশের নিশ্চয়তা

- শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বাধীন শ্রম ন্যায়পালের কার্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এটির কার্যকর দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিক সংগঠন স্থাপনের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে শ্রম আদালতের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। দর-কষাকষির চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবর্তীত শ্রম আইনের বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য কর্মমুখী ও বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহারযোগ্য কারিগরি দক্ষতা (পোর্টেবল স্কিলস) গড়ে তুলতে সহায়তা দিতে হবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার নির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ করে সারাদেশে একীভূত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কার্যকরী বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে যুবশক্তির ব্যবহার ও সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি

- বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের জন্য যুবদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করতে হবে এবং আগামীর শ্রমবাজারের জন্য তারা যাতে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রকল্প তথ্য, ই-সেবা ও চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- একটি বিশেষায়িত বিনিয়োগকারী সুরক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সেবা গড়ে তুলতে হবে, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন, প্রকল্প স্থানের নিশ্চিতকরণ এবং বিনিয়োগ-পরবর্তী সেবা প্রদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।
- ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রযুক্তি এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ-সংশ্লিষ্ট খাতের চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে হবে।
- ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষায়িত ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ক বা শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এসব খাতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক ও পেশাদারী ব্যবস্থাপক গড়ে তুলতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম হবে কিনা তা নির্ভর করবে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ও সাফল্যের ওপর এবং যুবসম্পদের অমিত সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার গড়ে তুলতে হবে যাতে জনমিতিক লভ্যতার (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) প্রকৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ করা যায়। এজন্য নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসডিজি-৮ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।

নীতি বিবৃতি ৩: কৃষির বৈচিত্র্যমুখী উৎপাদনশীল রূপান্তর

বাংলাদেশের কৃষি খাত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলেও বর্তমানে নানা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে কৃষি উৎপাদন ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে; আধুনিক প্রযুক্তি, কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা এবং অগ্র-পশ্চাৎ বাজার সংযোগের অভাব কৃষকদের উৎপাদনশীলতা, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন ও এর সম্ভাবনাকে সীমিত করে রেখেছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না, আর অন্যদিকে ভোক্তারা উচ্চ মূল্য দিয়ে কৃষি পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৩৭ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত মানুষ মাত্র ১২ শতাংশ জিডিপি উৎপাদন করছে, যা কৃষির শ্রম ও পুঁজির নিম্ন উৎপাদনশীলতার পরিচয় দেয়। তাই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনীতি গড়তে কৃষির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর এখন সময়ের দাবী।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

কৃষিকাজে দক্ষতা বৃদ্ধি

- কৃষির ভ্যালু চেইনে দক্ষতার ঘাটতি শনাক্ত করতে একটি জাতীয় দক্ষতা-চাহিদা মূল্যায়ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে আধুনিক কৃষিকাজ পরিচালন, প্রযুক্তি ব্যবহার ও বাজারসংযোগ এসব বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণসেবা জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ে কার্যকর ও মান সম্পন্ন পরামর্শসেবা নিশ্চিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি জ্ঞান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিঘাত সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অভিযোজন

- পরিবেশের ক্ষতি কমাতে জলবায়ু-বান্ধব কৃষি চর্চা (স্মার্ট কৃষি) সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে ক্ষুদ্র আকারের প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে। আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি গ্রহণে কৃষকদের যথাযথ প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয়ভাবে ছোট কৃষিযন্ত্র উৎপাদন ও সংযোজনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর-সুবিধা, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রারম্ভিক পুঁজি প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ শক্তিশালী করতে হবে।

প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও কৃষির আধুনিকায়ন

- কৃষিতে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও নতুন প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেখানে কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবেন ও প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে।
- যেসব কৃষক চুক্তিভিত্তিক চাষ (কন্ট্রাক্ট ফার্মিং) করে থাকেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে জমি চাষে পানি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলন এবং প্রাকৃতিক/অর্গানিক সার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের জন্য ফসল কাটার পর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে উন্নত সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৈচিত্র্যমুখী ফসল চাষে ভর্তুকি ও আর্থিক সহায়তা, উচ্চ-মূল্যের অর্থকরী ফসলের বাণিজ্যিক চাষ এবং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- কৃষি খাতে উৎপাদক এবং গ্রাহক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য B2C প্ল্যাটফর্ম এবং তথ্যপ্রযুক্তি স্থানীয় চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

অর্থায়ন ও প্রণোদনা

- ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ, আর্থিক সেবা ও বীমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা আধুনিক উপকরণ, সরঞ্জাম এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে পারে, এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।
- ভ্যালু চেইনে অংশগ্রহণকারীদের (প্রাথমিক উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত) মধ্যে সমন্বয় শক্তিশালী করতে হবে। গ্রামীন অ-কৃষি খাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে শহরমুখী যুব অভিবাসন কমাতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সেবায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে।
- কৃষকদের মধ্যে জলবায়ু ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে নিরাপদ চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ক্ষুদ্র ও পিছিয়ে পড়া কৃষকদের জন্য করণীয়

- ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য মানসম্পন্ন বীজ, সার, কীটনাশকসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সুলভে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের আবহাওয়া, বাজারদর, উত্তম কৃষিচর্চা, সরকারি প্রণোদনা ও বৈশ্বিক বাজার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে একটি ডিজিটাল তথ্যসেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, এবং মূল্য–প্রবণতা ও বাজার–চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন পরিকল্পনায় কৃষকদের সহায়তার জন্য শক্তিশালী ডিজিটাল তথ্য–ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- নারী কৃষকদের সম্পদ, তথ্য ও প্রশিক্ষণে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে কৃষকদের সহায়তায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের আয়ের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ, মূল্য–স্থিতিশীলতার জন্য কার্যকরী মজুত ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সরকারি ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে; কৃষক ও উৎপাদনকারী সংগঠন এবং সমবায় গঠনে উৎসাহ দিয়ে কৃষকদের বাজার-অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- কৃষক ও ক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে এবং শক্তিশালী বাজার সংযোগের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষ কৃষিপণ্যের জন্য ব্র্যান্ডভিত্তিক বা বিশেষায়িত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, এবং বেসরকারি খাত ও কৃষি সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

পরিচালন ও নীতি

- কৃষি খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারকে কৃষি নীতি ও আইন-কানুন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করতে হবে, যাতে এগুলো শিল্প ও বাজারের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ নিশ্চিত করতে পারে।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী রেন্টাল সেবা নিশ্চিত করতে একটি নির্দিষ্ট সেবা–প্রদানকারী সংস্থা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত ভাড়া/সেবা–মূল্য না নেওয়া হয়।
- জমির ইজারা নিরাপত্তা বিধানে ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পণ্যের বিশুদ্ধতা, আন্তর্জাতিক মান, ও প্রয়োজনীয় কারিগরি শর্ত পরিপালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ও সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি খাদ্য ক্রয় নীতি পর্যালোচনা করে তাকে কৃষক বান্ধব করতে হবে এবং কৃষকের কাছে সরাসরিভাবে এর সুফল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নানাবিধ কৃষিপণ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয়ের আওতায় আনতে হবে।

- ‘ই-চৌপাল’-এর মতো প্রযুক্তি নির্ভর এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণে উৎসাহ দিতে হবে।
- নতুন প্রযুক্তি, উচ্চমূল্যের রপ্তানিযোগ্য ফসল ও জলবায়ু–সহনশীল কৃষি পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে বিশেষ করে উচ্চমানের বীজ ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে জোর দিয়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের জন্য সহজঋণ, বীমা সুবিধা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বীমা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে সাশ্রয়ীভাবে বাজারজাতকরণ সম্ভব হয়।
- ফসল আহরণের পরবর্তীতে যে অপচয় ও ক্ষতি হয় তা হ্রাস করতে কৃষি পণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পরিকল্পিত কৃষি জোন বাস্তবায়ন করে কৃষির বহুমুখীকরণ ও বিশেষায়িতকরণকে সহায়তা দিতে হবে।
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী কৃষি পণ্য-মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে।
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিঋণ পেতে জমি বন্ধকী ব্যবস্থার অবসান করতে হবে।
- জেলা পর্যায়ে খাস জমি বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিহীনের সংখ্যা ৩ জনে উন্নীত করতে হবে।
- ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ অধ্যাদেশ বাতিল করতে হবে।
- খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা সংশোধন পূর্বক প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবার প্রতি ২.০০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে (বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদ, অনুচ্ছেদ-১৭(১) অনুসারে)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষকদের বাদ দিয়ে একটি কল্যানমুখী রাষ্ট্র বিনির্মানে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের কৃষির কাঠামোগত রূপান্তর ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে লক্ষ্যনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এ দুই উদ্দেশ্যই অর্জন করা সম্ভব হবে।

নীতি বিবৃতি ৪: গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চিতপকরণ

বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি থাকলেও শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। বিশেষত, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাবিত শিশুদের জন্য গুণগত শিক্ষার অভিগম্যতা সীমিত হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে মূল মূল চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকের ঘাটতি, ঝরে পড়ার উচ্চ হার, মুখস্থনির্ভর শিক্ষা এবং চাকরি-বাজারের সঙ্গে শিক্ষা-প্রদত্ত দক্ষতার অসামঞ্জস্যতা। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী ও ব্যক্তিখাত নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা, সাধারণ শিক্ষা ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষা সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা একটি দূর্বল ও সমন্বয়হীন ব্যবস্থাপনার স্বীকার। এছাড়া দূরবর্তী ও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়ের অভাব, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা, পুষ্টি ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা শিশুদের শিক্ষার মান ও অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। শিশুদের দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা নিশ্চিত করতে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার মান ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে বহুমুখী এবং সমন্বিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

শিখন ঘাটতি মোকাবিলায় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি সনাক্ত ও যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়। এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- যেসব শিক্ষার্থী পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করতে পারছে না বা সাধারণভাবে শিখনে দুর্বল, তাদের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এছাড়াও শিশুদের মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে মনঃসামাজিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

গুণমানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম ও যথোপযুক্ত পাঠদানের নিশ্চয়তা বিধান

- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীসহ সকল শিশুর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রকল্পভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক কার্যক্রম ও হাতে-কলমে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- উচ্চতর মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা উন্নত করতে শিক্ষা কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি ও কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখতে পারে।
- উত্তম মানের কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, কারিগরি শিক্ষার মান-মর্যাদা সম্বন্ধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে, তার প্রতি আগ্রহ জাগাতে হবে।
- শিখন অগ্রগতির সমন্বিত মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করতে হবে, যার মধ্যে কুইজ, শ্রেণিকক্ষে আলোচনা, নিবিড় মূল্যায়ন এবং প্রকল্প প্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, দক্ষতা বিকাশ এবং দলগত কাজের সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য সকল বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অংশীজন ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে কারিকুলা ও শিখন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। কউমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে।

যোগাতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ বিধান

- শিক্ষার কাংখিত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং যোগ্য স্নাতকধারীদের শিক্ষকতা পেশা বেছে নিতে উৎসাহিত করতে যথাযথ প্রণোদনা দিতে হবে। ২০২০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্রুত একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিশুর বিকাশ ও মনস্তত্ত্ব, মিথস্ক্রিয়ামূলক শিখন, সামাজিক-আবেগনিষ্ঠ শিখন, মূল্যায়ন কৌশল এবং মিশ্র শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিশুদের নিরাপদ শিখন পরিবেশ এবং মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মনঃসামাজিক সহায়তা প্রদানে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।
- শিক্ষকরা যাতে তাদের শিখন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে, সেজন্য 'শিক্ষক বাতায়ন' কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- অবসরপ্রাপ্ত বা উচ্চ মানের শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে নিয়োগ করে সব প্রতিষ্ঠানে সর্বোত্তম শিখন পদ্ধতি প্রচলিত করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষায় অভিগম্যতার ঘাটতি থেকে উদ্ভূত অসমতা মোকাবেলা

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে শিখন ফল পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথক উপাত্ত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় মোকাবিলায় বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে; প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যূনতম মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দিতে হবে।
- চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- ঝরে পড়া শিশু, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ বা শ্রমে যুক্ত শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনামূলক কর্মসূচী চালু করতে হবে।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।
- 'জাতীয় খাদ্য নীতি ২০১৯' অনুযায়ী স্কুলে মিড-ডে মিল কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা, ক্ষুদ্র আদিবাসী নৃগোষ্ঠী এবং চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোকে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষায় প্রযুক্তি ও মিশ্র পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ

- প্রচলিত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদানের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের (স্বপ্রণোদিতভাবে) শেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- মিশ্র শিক্ষায় অংশ নিতে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের হাতে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছে দিতে হবে। তাদের অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল ক্লাস, ওয়েবিনার, ই-বুক, ডিজিটাল লাইব্রেরি ও মোবাইল-ভিত্তিক শিখন সুবিধার আওতায় আনতে হবে।
- শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করতে হবে, যাতে তারা পাঠদানের প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।
- সকল বিদ্যালয়ে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (পিটিএ) শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে প্রান্তিক বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এসব কাজে অধিকসংখ্যক নারী/মা সদস্য যুক্ত করতে হবে। পিটিএতে কমপক্ষে একজন স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নবিষয়ক আলোচনার আয়োজন করতে হবে।

শিক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন

- ২০১০ সালের শিক্ষানীতির আলোকে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ কমপক্ষে ১৫%-এ উন্নীত করতে হবে এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে তা ২০%-এ উন্নীত করতে হবে।
- নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকর করতে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ব্যয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
- সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, অনুদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় (যেমন ইউনিফর্ম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ) নির্বাহে সক্ষম হয়।
- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পঞ্চম শ্রেণি থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার সেতুবন্ধন স্থাপন করতে হবে।
- বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাজেট ব্যবহারে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়।
- ২০১০ সালের শিক্ষানীতির ভিত্তিতে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রস্তুত করতে হবে এবং সেই আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা কেবলমাত্র একটি খাতভিত্তিক উদ্যোগ নয়, বরং এটা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের মূল ভিত্তি ও প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সকল অংশীজনের সমন্বিত পদক্ষেপ, প্রযুক্তি, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষার আওতায় এনে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে এবং জনমিতিক লভ্যতা অর্জনের পথ সুগম করতে হবে।

নীতি বিবৃতি ৫: গুণগত স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সেবাগ্রহীতার ব্যয় হ্রাস

বর্তমানে বাংলাদেশে গড় স্বাস্থ্য ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী নির্বাহ করতে হয় মানুষের পকেট থেকে। দেশে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাশ্রয়ী চিকিৎসা, দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত ওষুধ, উন্নত অবকাঠামো এবং তথ্যব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাদান, অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং জরুরি সেবার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মী সংকটের সমাধান, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় আশু প্রয়োজন। এসবের লক্ষ্যে বাজেট বৃদ্ধি, স্বচ্ছ ব্যয় এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। দূরবর্তী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সেবার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তি, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো, এবং রোগ নির্ণয় সুবিধার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

সাশ্রয়ী ও মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিতকরণ

- সকল মানুষের জন্য, বিশেষ করে অগ্রাধিকারমূলকভাবে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য, সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ওষুধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি নাগরিকের মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। কমপক্ষে ৭৫% প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে।
- জরুরি ওষুধের তালিকা হালনাগাদ করে এগুলির মূল্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- জরুরী ব্যতিরেকে অন্যান্য ওষুধের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।
- আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ওষুধের মূল্য কমাতে হবে।
- সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে আধুনিক, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কেন্দ্রীয় ওষুধ ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।

অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ উদ্যোগ

- প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে টেলিমেডিসিন, ভ্রাম্যমাণ/স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকার–এনজিও/সিএসও সমন্বয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সকল সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে র‍্যাম্প, উপযোগী অভ্যর্থনা ও প্রতিবন্ধীবান্ধব শৌচাগার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এসব শর্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোর জরুরি স্বাস্থ্যব্যয় হ্রাস করতে প্রিপেইড স্বাস্থ্যকার্ড চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
- জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- এমন একটি ন্যূনতম সুবিধা প্যাকেজ চালু করতে হবে যেখানে সবাই আগে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক সেবা গ্রহণ করবে, যা প্রয়োজন হলে পরবর্তী ধাপে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারী ও কিশোরীদের জন্য বিনামূল্যে ও মানসম্মত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং এ বিষয়ে জাতীয় সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- মাতৃস্বাস্থ্য, কিশোরী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আইন পর্যালোচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

- ১৯৮২ সালের প্রাইভেট প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স পর্যালোচনা আইনটি সময়োপযোগীভাবে সংশোধন করে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। এতে সেবার মান বজায় রাখা ও অনিয়ম হ্রাস করা সহজ হবে।
- ডিজিএইচএস, ডিজিএফপি, বিএমডিসি ও ডিজিডিএকে পর্যাপ্ত জনবল, প্রযুক্তি, আর্থিক সম্পদ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে যাতে তদারকি ও সেবার মান উন্নত হয়।
- স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ন্ত্রণ, অ্যাক্রেডিটেশন এবং নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে। এটি 'স্বাস্থ্যের অধিকার' বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে অগ্রসরতা নিশ্চিত করবে।

যোগসাজশের সংস্কৃতি মোকাবিলা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

- চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের ওপর ওষুধ কোম্পানিগুলির অনৈতিক চাপ বন্ধে ২০১৬ জাতীয় ওষুধনীতির আলোকে সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং এর মান্যতার বিষয়টি সার্বক্ষণিক নজরদারীতে রাখতে হবে। এতে রোগীদের স্বাস্থ্য ব্যয় হ্রাস পাবে।

সরকারি সেবা ব্যবস্থায় দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি

- শূন্যপদ পূরণ, ওষুধ ও সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালগুলোকে সেবাদানের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষের ওপিপি ব্যয় কমবে এবং দূরবর্তী সেবা সহজলভ্য হবে।
- দীর্ঘ লাইনের সমস্যা কমাতে সেবার চাহিদা আগেই মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় জনবল ও ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।। এতে সাধারণ মানুষ সরকারি সেবায় আগ্রহী হবে।
- স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরণ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। সেবাগ্রহণকারীদের মতামতের ওপর নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করতে হবে। এটি সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি বাড়াবে।
- মানসম্মত ওষুধ নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী মডেল ফার্মেসির সংখ্যা বাড়াতে হবে। এতে বাজার থেকে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ দূর করা সহজতর হবে।
- গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দূর করে সমন্বিত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে স্থানীয় পর্যায়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

- কমিউনিটি ক্লিনিক গোষ্ঠী, পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করাতে হবে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হবে।
- বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিটি কেন্দ্র/হাসপাতালকে মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য যুগোপযোগী করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের মতামত জানার লক্ষ্যে এনজিও/সিএসওগুলো তাদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে পারে। এতে সেবাগ্রহীতাদের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হবে।
- দেশের অতিদরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষকে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিখাতের হাসপাতালগুলোতে সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, যথাযথ বাজেট বরাদ্দ এবং কার্যকর সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব করতে হবে। এখন প্রয়োজন হলো সব অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করে একটি ন্যায়সংগত, মানসম্মত ও সবার জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এখন একান্তই জরুরী।

নীতি বিবৃতি ৬: সবার জন্য সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হলে এবং জনগণের কল্যান বিধানে সবার জন্য সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রাপ্যতা যে কোন বিচারেই অগ্রাধিকার প্রাপ্তির দাবীদার। অথচ জ্বালানি ঘাটতি, গ্যাসনির্ভরতা ও দুর্বল নীতি-ব্যবস্থাপনার কারণে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকির মুখে আছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কোভিড-পরবর্তী চাপ এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। এসডিজি ৭-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি রূপান্তর, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ উন্নয়ন, ন্যায়সঙ্গত মূল্যনীতি ও নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ বিশেষত বর্তমান সময়ে অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনীতি গড়তে জ্বালানি নীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস এখন সময়ের দাবী।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গ্যাসের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান

- জরুরি ভিত্তিতে নতুন গ্যাস অনুসন্ধানে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত পুনরুদ্ধারে গুরুত্ব দিতে হবে। বাপেক্সের মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদেশি ব্যয়বহুল চুক্তি যতটা সম্ভব এড়িয়ে অর্জিত দেশীয় সক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে।
- গ্যাস-সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি কেন্দ্রীভূত 'সেন্ট্রাল মডেল' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- দেশের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে।
- জ্বালানি খাতের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে।
- বিতরণ ও সঞ্চালন পর্যায়ে সিস্টেম লস হ্রাসের জন্য পুরোনো অবকাঠামো প্রতিস্থাপন ও সেগুলির প্রযুক্তিগত হালনাগাদ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি অর্থায়নের লক্ষ্যে বকেয়া বিল আদায়ে কার্যকর ও উদ্যমী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ

- সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও স্রেডার সমন্বিত কার্যক্রম নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে একটি সমন্বিত চাহিদা-চিত্র প্রস্তুত করতে হবে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরঞ্জামের স্থানীয় উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারকে উপযুক্ত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং আর্থিক ও কর প্রণোদনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে।
- কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সরকারকে বাজেট নীতি পুণর্মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- সরকারি অফিস, বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প অবকাঠামো এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করতে হবে। জাতীয় গ্রিডে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংযোগের সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করতে হবে।
- গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় বায়োম্যাস প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সৌরশক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কার্যকরভাবে বিতরণের জন্য স্মার্ট গ্রিড এবং স্মার্ট মিটারিং প্রযুক্তি প্রবর্তন করতে হবে।
- প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে।

- তরুণদেরকে নবায়নযোগ্য শক্তি ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও উদ্যোক্তা সহায়তা প্রদান করতে হবে।

আর্থিক চাপ হ্রাস এবং জ্বালানি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

- কুইক রেন্টাল (কিউআর) ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ধাপে ধাপে বন্ধ করার জন্য একটি সময়সীমাবদ্ধ 'প্রস্থান পরিকল্পনা' (exit plan) প্রস্তুত করতে হবে। সরকারকে আগামী দুই বছরের মধ্যে এই কেন্দ্রগুলো বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং বিদ্যমান চুক্তি ও লাইসেন্সের সঙ্গে সমন্বয় করে আর্থিক বোঝা হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ্বালানি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- একটি সুসংগঠিত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ও জাতীয় জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দেবে।

জাতীয় স্বার্থের চাহিদা পূরণে সুপরিকল্পিত ও স্বচ্ছ নীতি প্রণয়ন

- দেশে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি সুরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা, জাতীয় জ্বালানি মাস্টারপ্ল্যান, চাহিদার প্রাক্কলন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা, সংশোধন ও হালনাগাদ করতে হবে। সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক নথি সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।
- উৎপাদন ও বিতরণের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য চাহিদার পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা নীতি প্রণয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।
- বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার সময় সরকারকে সঠিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।
- নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী উপাত্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে এবং জ্বালানি চাহিদা, উৎপাদন ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের জন্য জাতীয় ডেটা ব্যাংক বা এনার্জি ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- এলপিজির দাম নির্ধারিত দামে বিক্রিতে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, ভোক্তা অধিদপ্তর ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কার্যকর সমন্বয় জোরদারে জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগে নিতে হবে।
- এলপিজির আমদানিকারক ও এলপিজির পরিবেশকদের মজুদ, সরবরাহ ও খুচরা বিক্রয় কর্মকাণ্ডের তদারকি জোরদার করতে হবে।

জ্বালানি দক্ষতা ও চাহিদা-নির্ভর ব্যবস্থাপনা (DSM)

- সরকারকে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি গ্রহণে কর ছাড় ও প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।
- পিক ও অফ-পিক সময়ের ভিত্তিতে বিভাজিত শুল্ক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ বা জ্বালানির সর্বোচ্চ চাহিদা (পিক) নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- জ্বালানি খাতের কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য দক্ষ ডিএসএম প্রয়োগ করতে হবে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন সর্বোচ্চ রাখতে লোডগুলোকে বেস, ইন্টারমিডিয়েট ও পিক সময়ে ভাগ করে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।
- আঞ্চলিক বাস্তবতা বিবেচনায় আগামী পাঁচ বছরের বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের পূর্বাভাস প্রস্তুত করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত বা কম উৎপাদনের ঝুঁকি এড়ানো যায় এবং পরিকল্পনা সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

বিইআরসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বাধীন জ্বালানি কমিশন গঠন

- বিএইআরসির কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করে ব্যয় নির্বাহ ও শুল্ক নির্ধারণসহ নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম শক্তিশালী করতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'স্বাধীন জ্বালানি কমিশন' গঠনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

জ্বালানি খাতে সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকরণ

- সাইবার নিরাপত্তা ও অভিঘাত-সহনশীলতা নিশ্চিত করতে জ্বালানি খাতে জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে।
- জ্বালানি পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপ থেকেই সাইবার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের উচ্চ গুণমান ও নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতকরণ

- বিদ্যুৎ সরবরাহকে স্থিতিশীল ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- স্থিতিশীল ভোল্টেজ নিশ্চিত করতে হবে এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারকে জ্বালানি পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে।

সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

- উচ্চ-ক্ষমতার সঞ্চালন লাইন ও কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা মোকাবেলায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

একটি বিকল্প রূপান্তরশীল জ্বালানি হিসেবে এলএনজির ব্যবহার

- সরকারকে এলএনজি ব্যবহারে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও ক্যাপাসিটি চার্জ জনিত ঝুঁকিগুলো স্পষ্টভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।
- বৃহৎ বিনিয়োগের আগে সরকারকে এলএনজি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করে আমদানি-নির্ভর উৎপাদনের অর্থায়ন, রাজস্ব ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিশদভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

জ্বালানি খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) প্রসার ঘটানো

- জ্বালানি খাতে যথেষ্ট বিনিয়োগকে কার্যকর নীতি প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

কয়লা ও পারমাণবিক জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস

- সরকারকে কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে টেকসই ও দূষণমুক্ত জ্বালানি বিকল্পের ওপর মনোযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে জ্বালানি নিরাপত্তা ও সঠিক জ্বালানি নীতি বাস্তবায়ন এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, জ্বালানি রূপান্তর এবং সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানীর নিশ্চয়তা বিধান করে বাংলাদেশের টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে

নীতি বিবৃতি ৭: পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং দক্ষ ও সহজলভ্য সরকারি পরিষেবা

বিগত সময়ে বাংলাদেশে নগরায়ণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শহর ও শহরতলিতে বসবাসকারী জনসংখ্যার ওপর উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি করছে। অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত হওয়ার কারণে দ্রুত নগরায়ণ বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক গণপরিষেবা—যেমন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—প্রাপ্যতা এবং এসবের গুণগত মান নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যারা বিভিন্ন পরিষেবার জন্য উচ্চ মূল্য প্রদান করেও যথাযথ মান ও প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে নানবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নগর পরিবেশে দূষণ, আবর্জনা, জলাবদ্ধতা এবং জনস্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; পাশাপাশি উন্মুক্ত স্থান সংকুচিত হওয়া নগরবাসীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও কার্যকর নগর প্রশাসন গড়ে তুলতে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের জন্য মৌলিক পরিষেবা ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন এখন একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

- স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করতে হবে।
- নগর এলাকায় গণপরিসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে অস্পষ্টতা দূর করতে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন ও নীতিমালা হালনাগাদ, সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে, এবং তাদের সক্ষমতা ব্যবহার করে নতুন ও উদ্ভাবনী বিনিয়োগ কৌশল প্রস্তুতি ও প্রয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় রাজউক প্রস্তুতকৃত বিস্তৃত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ)-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভারসাম্যপূর্ণ নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কর্মসম্পাদনভিত্তিক বাজেট পদ্ধতি চালু করতে হবে, যাতে সম্পদের কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহার সম্ভব হয়।
- স্থানীয় সরকারের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের মধ্যে অযৌক্তিক ব্যবধান কমাতে কার্যকর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারী জোরদার করতে হবে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষক দল গঠন

- স্থানীয় পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক বা আধা-আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষক দল গঠন করতে হবে, যাতে সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।
- নাগরিকদের সেবার অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি সেবা আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করতে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।
- নগর উন্নয়ন নীতি ও প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে স্থানীয় জনগণের মতামত সংগ্রহ এবং খসড়া পরিকল্পনার আগে গণশুনানি আয়োজন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- নাগরিকদের মতামত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া জানানোর লক্ষ্যে একটি সহজ পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- নগর সেবার মানোন্নয়নে নাগরিক, নীতিনির্ধারক ও সেবা প্রদানকারী—এই তিন পক্ষের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ আয়োজনের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে নাগরিক ফোরাম গঠন করতে হবে।

ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিতকরণ

- সরকারকে সব নাগরিকের জন্য নগর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে সেবার মান, ন্যায্য অভিগম্যতা ও সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা "কাউকে পেছনে রাখা যাবে না (এলএনওবি) দর্শনের আলোকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নগর কেন্দ্রগুলোতে তাদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, দিবাযত্ন কেন্দ্র ও বিনোদনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- আবাসন পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে হবে ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে, এবং বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের মানুষের অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।
- বস্তিবাসী, পথবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে জন্মনিবন্ধন ও এনআইডি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

- নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে সেগুলোতে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী জলবায়ু সংক্রান্ত অর্থায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি তহবিল থেকে সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।
- বাংলাদেশের সকল সড়ক নিরাপদ করার জন্য ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৩.৬ ও ১১.২ এবং জাতিসংঘের বৈশ্বিক পরিকল্পনা ও ৪র্থ গ্লোবাল মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অন রোড সেফটি (২০২৫)-এর প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচের আলোকে একটি"সড়ক নিরাপত্তা আইন" প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- পানি ও মাটির দূষণ রোধে কার্যকর মনিটরিং ও আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, এবং উপজেলা পর্যায়ে পানি ও মাটির মান পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- প্লাস্টিক দূষণ রোধ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পরিবর্তনসাপেক্ষ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে যা নগর ও গ্রামাঞ্চল উভয়ের চাহিদা মেটাতে পারে।
- একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single-use Plastic) উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধে কার্যকর নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও আবাসনস্থলসহ সকল পর্যায়ে আধুনিক বর্জ্য সংগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য বিন্যাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব করতে হবে।

উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

- নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে তথ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং সরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক নগর এলাকায় গণপরিষেবার চাহিদা নির্ধারণের জন্য বিভাজিত ও বিস্তারিত উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন

- নগর পরিকল্পনা ও নগর শাসন ব্যবস্থায় সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও গুণগত জীবনমান নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদ্যমান মহাপরিকল্পনা, বিল্ডিং কোড ইত্যাদির নকশায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং স্বল্পমেয়াদি ব্যয়বহুল পদক্ষেপ এড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অনুসারে এই পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই গৃহায়ন, বর্জ্য ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে নগরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এসবের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।
- টেকসই নগরের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে বিশেষজ্ঞ ও বেসরকারি অংশীজনের মতামত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।

আধুনিক, টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

- সকল এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বর্জ্য পানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- কঠিন ও তরল বর্জ্যের পৃথক সংগ্রহ, পরিবহণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং নগর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resource Management):

- সুপেয় পানির সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, এবং নগর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
- খালের জমি, নালা, জলাশয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে হবে।
- নদী, খাল ও হ্রদসহ নগরীর জলাশয়গুলো সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং নদীর আশেপাশে সবুজ বাফার জোন প্রস্তুত ও তার সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- বৃহৎ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Rainwater Harvesting) ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং ভূগর্ভস্থ পানির পুনরুদ্ধার ও পরিবেশবান্ধব পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- জলাশয়ের অবৈধ দখল ও বর্জ্য নিষিদ্ধ করতে ভূমি জোনিং নীতিমালা প্রয়োগ, জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

নগর পরিষেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি

- নগর অঞ্চলে উচ্চমানের সেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।
- সুবিধাবঞ্চিত, সামাজিকভাবে বিচ্যুত ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে লক্ষ্যনির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- নগর পরিবহনকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঠামোতে নিয়ে আসতে হবে।
- নিম্নআয়ের মানুষ ও সস্তা পণ্য ক্রেতাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সময় ও এলাকায় হকারদের ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।
- নগর পরিষেবা সম্পর্কিত বিশেষায়িত একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে নগর পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত কোর্স চালু করা হবে।
- ওয়াশ-এর সাথে যুক্ত সকল বাজেট ও প্রকল্পের নকশায় নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (যেমন: নদীভাঙন কবলিত, উপকূলীয়) চাহিদা অগ্রাধিকারভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্যানিটেশন সরঞ্জাম উৎপাদন, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির স্থানীয়করণের মাধ্যমে এই খাতে দক্ষ ও আধা-দক্ষ যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশে টেকসই ও ন্যায্যতাভিত্তিক নগরায়ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণভিত্তিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। শক্তিশালী নগর সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসিত নগর ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধান এখন অপরিহার্য

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো ও সবার জন্য সহজলভ্য গণপরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে নগরায়ন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে ও তা আগামীতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাবে। একটি নিরাপদ বসবাসযোগ্য ও দক্ষ সেবা নিশ্চয়তাকারী নগরায়ণ বাংলাদেশের জনগণের দাবী এবং তাদের অধিকার।

নীতি বিবৃতি ৮: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক সুরক্ষার আওতা সীমিত যেখানে শহর ও গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। কোভিড-১৯, মূল্যস্ফীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন এই দুর্বল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করেছে। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা (USP) বাস্তবায়ন তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য কাউকে পেছনে না রাখার লক্ষ্য পূরণে অপরিহার্য ও তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নাগরিকের জীবনচক্রভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবিলায় ন্যায়সংগত, পর্যাপ্ত ও টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০১৫ (NSSS) এই রূপান্তরের একটি ভিত্তি স্থাপন করলেও লক্ষ্যনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা জোরদার করতে এবং সমন্বিত নীতিপ্রয়োগ নিশ্চিত না হলে এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সর্বজনীন সুরক্ষা কাঠামোর দিকে অগ্রসর করে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নির্ধারণ

- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা মূল্যায়ন করে, অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও বয়স্কদের আয়নিরাপত্তা এবং বেকার-অক্ষম-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য সঠিক তথ্যভিত্তিক চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে।

অংশীজনদের সক্রিয় সহায়তায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে অংশীজনদের যুক্ত করে, বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীদের অগ্রাধিকার দিয়ে, চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রস্তুত করতে হবে, যা পরে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালার সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য টেকসই অর্থায়ন

- সংবিধান ও জাতীয় কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক সুরক্ষার নীতি ও কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছ ও সমন্বিত অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের বর্তমান আর্থিক সক্ষমতার মধ্যেই সুবিধাবঞ্চিতদের চাহিদা পূরণ ও সুবিধাভোগীদের সুবিধা বৃদ্ধি সম্ভব; তবে এর কার্যকর ও টেকসই বাস্তবায়নের জন্য একটি সুচিন্তিত রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রবীণদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক পেনশন চালু করে ভাতার পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে প্রবীণ নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে ভাতা সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রবীণদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক অনিরাপত্তা হ্রাসে প্রবীণ-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও দীর্ঘমেয়াদি যত্নব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে তুলতে হবে।
- শিশুর জন্মনিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ, নির্ভরযোগ্য ও বিনামূল্যে করার উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে প্রতিটি শিশু নির্ভয়ে এই সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ও বসতভিত্তিক ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

- পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Employment Centre) স্থাপন করতে হবে।

- জেলা কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিকে (Employment Centre) উৎপাদনমুখী ও শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। কেন্দ্রগুলো যাতে প্রশিক্ষণ, চাকরিতে নিযুক্তির পরামর্শ এবং স্টার্ট-আপ/ব্যবসায় সহায়তা দিতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় বেসরকারি খাত ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করে শ্রমশক্তির চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।

শিশু সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ

- শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য শিশু বিষয়ক সকল মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সরকার প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর তালিকায় এতিম শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথবা পৃথক শিশু অনুদান চালু করতে হবে।
- বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর জন্ম পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে। জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ, নির্ভরযোগ্য ও বিনামূল্যে করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- শিশুদের জন্য নয় (৯) বছর মেয়াদি অবৈতনিক, মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- শূন্য (০) থেকে ছয় (৬) বছর বয়সি দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা সকল শিশুর জন্য 'শিশু অনুদান' চালু করে দারিদ্র্য নিরসনে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিশুদের জন্য সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো

- সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা চালু করার জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন, সামাজিক বিমা ও অন্যান্য উদ্যোগের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কোভিড-১৯ মহামারি ও ভবিষ্যতে সম্ভাব্য নতুন যেকোনো মহামারি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্নীতি, অপচয় হ্রাস এবং যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করতেঁ হবে।
- বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে যুক্তিসংগত মূল্যে মানসম্মত সেবা প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

উপাত্তের সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তৃত ও মানসম্মত ডেটাবেজ থাকতে হবে যা নিয়মিত হালনাগাদ সম্বলিত এমআইএস ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করবে, এবং অপচয় ও বিচ্যুতি হ্রাস করতে সহায়তা করবে।
- ইউএসপি কর্মসূচি শক্তিশালী করতে হবে এবং এনএসএসএসে প্রস্তাবিত জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচলন

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি কার্যকর করতে অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি সচ্ছতাভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং নাগরিকদের অভিযোগ জানাতে সক্ষম এমন একটি টোলবিহীন হেল্পলাইন স্থাপন করতে হবে। বিশেষ করে প্রান্তিক এলএনওবি জনগোষ্ঠীর জন্য হেল্পলাইনটি বিশেষভাবে সক্রিয় রাখতে হবে, যাতে তারা সরাসরি অভিযোগ জানাতে সক্ষম হয়।

ইউএসপি কার্যক্রমের দক্ষতা নিরূপণে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

- ইউএসপি কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা গঠন করতে হবে এবং এতে স্থানীয় নাগরিক ও সুবিধাভোগীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও ব্যয়ন-সাফল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

ইউএসপি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি

- ইউএসপি কর্মসূচির কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুবিধাভোগীদের শনাক্তকরণ, নিবন্ধন, সেবা প্রদান, পরিবীক্ষণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ও সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী শক্তিশালী হলে বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আয়, ভোগ ও সম্পদ বৈষম্য হ্রাস করতে হলে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে অর্থায়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমন্বিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সেবার সহজলভ্যতা ও সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করাও জরুরি; যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে।

নীতি বিবৃতি ৯: জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক অভিঘাত মোকাবিলা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবকাঠামো, নদীপ্রবাহ ও উপকূলীয় অবস্থান দেশের জলবায়ু ঝুঁকিকে বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমান্বয়ে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। ঘন ঘন বন্যা, নদীভাঙন, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকিতে ফেলছে। নারী, শিশু, কৃষক, হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্বল জনগোষ্ঠী, অক্ষম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এসবের প্রতিকারের লক্ষ্যে সমন্বিত ও স্থানীয়ভাবে উপযোগী অভিযোজন উদ্যোগ নিতে হবে, বিশেষ করে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তব চাহিদার নিরীখে বাস্তবায়িত হবে, এবং জলবায়ু অভিঘাতের প্রেক্ষিতে অর্থনীতি ও জনজীবনের টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩–৫০)-এ প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সেগুলোকে পরবর্তী জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ব্যবহার করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপযোগী অভিযোজন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসব পদ্ধতি কতটা অনুসরণযোগ্য ও সম্প্রসারণযোগ্য তা যাচাই করতে হবে।
- হাওর অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করতে সংরক্ষিত এলাকার পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে।
    - সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বিশুদ্ধ করে স্থানীয় মানুষের গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে।
    - প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা যোগ করে সেগুলোর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
    - বন-উজাড়, জলাশয় থেকে বালি-পাথর উত্তোলনসহ পরিবেশধ্বংসী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং কৃষিনীতিতেও এসব সুরক্ষা বিধান প্রতিফলিত করতে হবে।
    - সড়ক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলোতে জরুরি চিকিৎসাসেবার জন্য হাইওয়ে ট্রমা সেন্টার স্থাপন করতে হবে।
- জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে ও এটি কার্যকর করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।
    - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণভিত্তিক একটি জলাশয় বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে একটি সমন্বিত জলজ কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জলজ আবহাওয়াবিদ্যার বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহের মান উন্নয়ন, নিয়মিত পর্যালোচনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।
    - স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণমান ও লবণাক্ততার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং নীতি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পরিবহন, গৃহায়ন ও জলবায়ু বান্ধব কৃষি খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

- এ ধরণের পরিবেশবান্ধব রূপান্তর তরুণদের জন্য সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ বাড়াতে হবে ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।
- সকল ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগপরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে।
- স্রেডার আওতায় গৃহীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।
    - নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাত্রা মাত্র ৩.৫%। এ প্রেক্ষাপটে স্রেডার অধীনে চলমান সৌর ও বায়ু প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং 'নেট মিটার' ভিত্তিক প্রকল্পগুলোকে নীতিগতভাবে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে (এসব বিষয়ে জ্বালানি সংশ্লিষ্ট নীতি বিবৃতি ৪ এ বিশদভাবে বলা হয়েছে)।
- অবৈধ বালি উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত মূল্যায়ন ছাড়া কাউকে বালি উত্তোলনের অনুমতি না দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
    - অবৈধ বালি উত্তোলন নদীভাঙনকে আরও তীব্র করছে। সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিবেশগত মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়া ব্যতীত এ ক্ষেত্রে কোনো অনুমতি দেয়া যাবে না। অনুমোদিত উত্তোলন থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ও নেতিবাচক অভিঘাত প্রশমন কার্যক্রমে ব্যবহার করতে হবে।
    - বায়ু ও পানিদূষণ বেড়ে যাওয়ায় দূষণকারীর ওপর জরিমানা আরোপের কঠোর নীতি চালু করতে হবে, যাতে সংগৃহীত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
- জটিল পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টনের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
    - বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ সমগ্র দেশে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পরিবেশগত মান হ্রাস মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
    - আর্সেনিক, লবণাক্ততা ও বন্যাপ্রবণতা এবং ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে লক্ষ্যনির্দিষ্ট বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য জলবায়ু অর্থায়ন থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।
    - কামারের চরসহ ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনপ্রবণ এলাকায় স্থায়ী সিসি ব্লক বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং দুর্গম চরাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- জলবায়ু প্রভাবিত অভিবাসী, বাস্তুহারা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে নীতি প্রণয়নে বেসরকারি অংশীজনদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
    - অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজ, এনজিও ও বেসরকারি পরামর্শকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি সংস্থা ও অংশীজনদের সমন্বয়ে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরতে হবে এবং বৈশ্বিক সহায়তার দাবী জানাতে হবে।
    - পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পিতভাবে সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে ও কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।
    - 'সবার জন্য ওয়াশ'লক্ষ্য অর্জনে পানির অপচয় রোধ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন: ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট) সম্প্রসারিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে সরকারি–বেসরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে।

- জলবায়ু প্রভাবজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে

অর্থায়ন ও মূল্যায়ন

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের প্রকল্পগুলো কতটা কার্যকর ও টেকসই হয়েছে তা জানার জন্য একটি বিশদ ও গভীর মূল্যায়ন করতে হবে। এই মূল্যায়ন ভবিষ্যতের জলবায়ু প্রকল্প নকশায় নীতিনির্ধারকদের তথ্য ও উপাত্ত ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
- বৈশ্বিক পরিসরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দরকষাকষির সক্ষমতা জোরদার করতে কার্বন নিঃসরণের প্রতিবেদন হালনাগাদ, তথ্যভিত্তিক ও মানসম্মতভাবে প্রণয়ন করতে হবে। বনভিত্তিক আর্থ-সামাজিক সুবিধার মূল্যায়নের জন্য 'বনের বাস্তুতন্ত্র মূল্যায়ন' সমীক্ষা প্রস্তুত করতে হবে।
    - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করতে বনকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে, যা নীতিনির্ধারকদের টেকসই ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গঠনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
- জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য সমীক্ষা চালু করতে হবে।
    - জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সমন্বিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যা ক্ষতিপূরণ দরকষাকষিতে প্রমাণভিত্তিক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে একটি বিশেষায়িত শাখা বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার দায়িত্ব হবে এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রস্তাব, নথি ও প্রকল্প নকশা প্রস্তুত করা।
    - বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে অভিগম্যতা বাড়াতে এবং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে জলবায়ু উপাদান আলাদা করতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা পালন করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে একটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা প্রস্তাব, নথি ও প্রকল্প প্রস্তুত করবে।
    - উন্নত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ন্যূনতম একজন যুগ্ম সচিবকে জলবায়ু পরিবর্তন-কেন্দ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।
    - বাংলাদেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণে জরিমানা নীতি প্রবর্তন করতে হবে এবং অপরাধের নিরীখে জরিমানা আদায় করতে হবে।

স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উদ্ভাবনী সমাধান, লক্ষ্যভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ও জবাবদিহিতামূলক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদান ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এই পদ্ধতি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে, প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন যাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করবে এবং স্থানভিত্তিক জলবায়ু পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

নীতি বিবৃতি ১০: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নির্মূলীকরণে আইন ও বিচারব্যবস্থা

বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর অধিকার সুরক্ষা এখনও একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা হিসাবে বিরাজমান। সংবিধান ও বিশেষ আইনসমূহ, যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা আইন, যৌতুক নিরোধ আইন এবং মানবপাচার প্রতিরোধ আইনের মাধ্যমে যথাসাধ্য নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও চলমান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থেকেই যাচ্ছে, এবং নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই সুরক্ষা পাচ্ছেন না। ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ এবং বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন নারীদের জন্য ন্যায় ও সুরক্ষার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে। আইনের শাসন ও প্রয়োগের দুর্বলতা, যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব, প্রাসঙ্গিক তথ্যের ঘাটতি এবং সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা ভুক্তভোগী নারীদের অধিকার প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য কার্যকর নীতি ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

আইন সংস্কার

- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করে নারীর পারিবারিক ও জনপরিসর-জীবনে সম-অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী এবং পুরুষের সমান মজুরী নির্ধারণ আইন ও নীতি প্রনয়ন করে তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার সব নারীর জন্য ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া সহজলভ্য ও সুলভ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সহিংসতা মোকাবেলায় বিদ্যমান আইন ও নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রগতিশীল, সংস্কারমূলক ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- বহুবিবাহ, তালাকপ্রাপ্ত নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং নারীর নিরাপত্তা ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বৈষম্যমূলক বিভিন্ন বিধান বাতিল করতে হবে।
- নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সমান অংশ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীদের সমান অভিভাবকত্বের অধিকার দিতে হবে এবং একটি সমন্বিত পারিবারিক বিধি প্রণয়ন করে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি বাংলাদেশের সিডও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪৯৩-৪৯৫ ধারা অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগের জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়; এটি সহজ করতে প্রাসঙ্গিক বিধানটি পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এ বিশেষ পরিস্থিতিতে বাল্যবিবাহের অনুমতি দেওয়ার ধারাটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, যেহেতু প্রায়শই এটির অপব্যবহার হয়ে থাকে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ অনুযায়ী মামলার সাজার হার মাত্র ৩%; এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দ্রুত ও কার্যকর বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর 'ধর্ষণ' সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা ও সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে বৈবাহিক ধর্ষণ, অল্পবয়সী ছেলে ও বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের যৌন হয়রানি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচার চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্যতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে এটি ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নারীদের তাদের পিতামাতার সম্পত্তিতে সমান অংশপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত উত্তরাধিকারের আইন প্রণয়ন করতে হবে।

- হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারকে 'যৌন হয়রানি' অপরাধের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনলাইন এবং সাইবার হয়রানিকেও আইনের আওতায় আনতে হবে।
- স্থানীয় বেআইনি বা অবৈধ সালিশ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করতে হবে। এই ব্যবস্থায় দেওয়া সাজা আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করতে হবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- চিহ্নিত সমস্যা সমাধান এবং বিদ্যমান মনোভাব বা আপত্তি প্রত্যাহারসহ সিডও-এর চাহিদা পূরণ করে বৈষম্য বিরোধী বিল ২০২২ প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে হবে।
- সরকারকে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে, যাতে জেন্ডার বৈষম্যের প্রকৃত পরিস্থিতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।
- ধর্ষণের মতো সংবেদনশীল মামলায় ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা পায়।
- হাইকোর্টের সাত দফা নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্ষণ মামলার দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি বিলোপ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯০ (Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) গার্হস্থ্য এবং গৃহকর্মীদের উপযুক্ত কাজ আইএলও সনদ ১৮৯ (C189 Convention on Domestic Workers) এ অনুস্বাক্ষর করতে হবে।
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য মোট করের ওপর ৫% থেকে ১০% পর্যন্ত কর রেয়াতের (Tax Rebate) বিধান রেখে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আইনী সহায়তা ও জবাবদিহিতা

- ন্যাশনাল লিগাল এইড সার্ভিসের প্রধান ও জেলা কার্যালয়গুলোকে যথাযথ সক্ষমতা ও মানবসম্পদ দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের আইনী সহায়ক কমিটিগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে সক্রিয় করতে হবে।
- সকল বিচারপ্রার্থী নারীদের ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান আইনী ও প্রক্রিয়াগত বাধাগুলো চিহ্নিত করে আইন সংস্কার, যথাযথ সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দেশের যে কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে আইনী সেবা, সহায়তা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সকলের জন্য সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয়কেন্দ্র এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এগুলোকে ন্যূনতম মানের সেবা দিতে সক্ষম করতে হবে ও স্বাধীন তদারকির আওতায় আনতে হবে।
- ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা শুধুমাত্র আইনগত ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না। পুলিশ, চিকিৎসা ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বীকৃতি, জবাবদিহিতা এবং সমন্বয়ও নিশ্চিত করতে হবে।
- অন্তত বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এবং ডিএনএ পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে। ভুক্তভোগী ও অপরাধীর জন্য প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষিত বিশেষ পুলিশ দল গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি থানায় নারী পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- দেওয়ানি আইন সংশোধন এবং পারিবারিক আদালতের ক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে তালাক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর নারীরা দেনমোহরের টাকা দ্রুত পেতে পারেন।
- অভিবাসী সম্পর্কিত সকল বিষয় পরিচালনায় নারী অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং মজুরি বৈষম্য ও বিরোধ সমাধানের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- পুলিশ, বিচারক ও সরকারি কৌশলীদের জন্য জেন্ডারভিত্তিক বিচার ও বিধান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন করতে হবে যাতে তারা নিপীড়নের প্রেক্ষাপট বুঝতে পারে।
- প্রতিটি শিশুকে সংবিধান অনুযায়ী বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবায় রূপান্তরিত করতে হবে এবং নারীর মানসিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- নারী অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ ও প্রেরণ সংক্রান্ত আইন হালনাগাদ করতে হবে, যার মধ্যে আবাসন ব্যবস্থা, মৃত্যুজনিত কারণের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও জমিতে সকল সন্তানের সম-অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- অবেতনিক সেবাকর্মে নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীর অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিবন্ধিত সকল দলের প্রতিটি স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রান্তিক পর্যায়ের নারী (দলিত, হরিজন, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময়, প্রতিবন্ধী এবং যৌনকর্মী) বিশেষ করে যৌনকর্মীদের বিকল্প কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- হিজড়া ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্রে তাদের হয়রানি প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কঠোর আইনি ব্যবস্থা ও নিবিড় মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।
- হিজরা ব্যক্তিদের আইনি প্রক্রিয়াকে সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে যাতে তারা সহজে সেবা পেতে পারেন এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।
- অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং সাইবারবুলিং প্রতিরোধে কার্যকর নীতি ও আইন প্রয়োগ করতে হবে।
- ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ ও যৌন পাচার চক্র নিয়ে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

শিশু, নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর আইন এবং আইনী সংস্কার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের সব অংশীজনকে এক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অপরাধীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আইন প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। নারীর অধিকার রক্ষা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে সচেতন নাগরিক সমাজকে হতে হবে সরকারের সক্রিয় সহযোগী।

নীতি বিবৃতি ১১: জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তারা প্রান্তিকতা, অবহেলা, বৈষম্য ও বিভিন্ন সেবায় সীমিত অভিগম্যতার শিকার। কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে তাদের দুরবস্থা আরও প্রকট হয়েছে। দেশের নীতি ও আইনে—যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল—সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও এসবের কার্যকর বাস্তবায়ন সীমিত থেকে গেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও সমঅধিকার নিশ্চিত করতে আরও শক্তিশালী, সমন্বিত ও টেকসই পদক্ষেপ প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ

- সকল নাগরিকের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে (বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদ ধারা-৩ এবং বাংলাদেশ সংবিধান ধারা-৩২ অনুসারে)।
- বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে (বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-২২ অনুসারে)।
- কর্মহীনতা/বেকারত্ব দূরীকরণে ন্যায্য মজুরীসহ বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি স্কিম চালু করতে হবে (বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-২০(১) অনুসারে)।
- পরবর্তী আদমশুমারিতে নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য বিস্তৃত প্রশ্নাবলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দলিত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাযথ গণনা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিগত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পরিচয় সঠিকভাবে শনাক্তকরণ এবং উপাত্ত ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য নীতি বিশ্লেষক, গবেষণা সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।
- দলিত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও আবাসনের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে না।
- প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার জাতীয় ও মাদরাসা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে যে কোনো ধর্ম, বিশ্বাস বা জাতিগত সম্প্রদায়ের অবমাননাকর বিষয় বাদ দিয়ে সহনশীলতা, সম্প্রীতি, নিজ নিজ ধর্মচর্চার স্বাধীনতা এবং বহুত্ববাদী সমাজগঠনকে উৎসাহিত করে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় সরকারকে বেসরকারি অংশীজন ও এনজিওর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এক যোগে কাজ করে যেতে হবে।
- সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হুমকি, হয়রানি ও বৈষম্য রোধে কার্যকর আইন ও নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং বিচারিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

- সমতলের আদিবাসী ও ভূমি অধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ থেকে দ্রুত মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।
  - রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯৭ ধারা অনুযায়ী অনিয়মিত জমি হস্তান্তর পুনরুদ্ধারে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি কমিশন/টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।
  - পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা জোরদার করতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।
  - প্রথাগত বসতি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ প্রতিরোধ এবং ভূমি পুনর্বণ্টন ও উন্নয়ন প্রকল্পের নামে যথেচ্ছ উচ্ছেদ বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠার পাশাপাশি জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- সকল খাসজমি দখলমুক্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে অনতিবিলম্বে বন্দোবস্ত প্রদান (বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-৪২ অনুসারে) করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

- সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষার জন্য 'সংখ্যালঘু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশন' প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করতে হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)-কে পর্যাপ্ত সম্পদ ও স্বাধীন কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ কার্যকরভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে পারে। কমিশনকে দেওয়া ক্ষমতার মধ্যে বিগত ১০ বছরের মধ্যে সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলা পর্যালোচনা করার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

- সংখ্যালঘু, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অনুকূল নীতি গ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- এনজিওগুলোকে তাদের কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে, যাতে সুবিধাগ্রহীতাদের শনাক্তকরণ, তহবিল বরাদ্দ এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সরকারি হস্তক্ষেপ বা অহেতুক নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে নীতিমালা বাস্তবায়ন

- বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার আছে। এই অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বক্তব্য সংবিধানের মূল নীতির ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য করতে হবে।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি চাকরিতে তাদের কোটা পুনর্বহাল করতে হবে ও আদিবাসী নারীদের জন্য সংসদের উচ্চ/নিম্ন কক্ষে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধি, ২০১৯ ও বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, নিবন্ধন ও সনদ প্রদান বিধি, ২০০৬ সংশোধন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ কোটা বা আসন সংরক্ষণ করতে হবে। এসব গোষ্ঠীর জন্য সহায়ক শিক্ষক নিয়োগের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সব ধারা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে এবং এ জন্য একটি সুস্পষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে। একই সঙ্গে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ভূমি কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বৈষম্যবিরোধী আইন আগামী সংসদে উত্থাপনের আগে নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে।
- সাইবার নিরাপত্তা আইনকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ এবং সামাজিক সুরক্ষা ও পেনশন কর্মসূচিতে তাদের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বহুত্ববাদী সমাজ গঠনে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শিক্ষানীতিকে শক্তিশালী করতে হবে, যা সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

- **নতুন নীতিমালা প্রণয়ন**
  - ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মৌলিক সেবার ঘাটতি রয়েছে, সেসব এলাকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এর পরবর্তীতে এসব জনগোষ্ঠীর বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী লক্ষ্যভিত্তিক ও কার্যকর উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
  - পর্যটন এলাকায় বসবাসরত সমতল ও পার্বত্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এমন পর্যটন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যা স্থানীয় জনগণের জন্য এ শিল্পের বিকাশের সুফল ভোগ করতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে ন্যায়, সমতা ও অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠন আজ সময়ের দাবি। সকল নাগরিকের সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কাউকে পেছনে না রাখার যে প্রত্যয় এস.ডি.জি.-তে ব্যক্ত করা হয়েছে তার প্রকৃত বাস্তবায়নের মাপকাঠি হবে বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে আমরা কতটুকু অগ্রসর ও সক্ষম হচ্ছি তার ওপর।

নীতি বিবৃতি ১২: সক্রিয় নাগরিকতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার, ভোগ, সমান অংশগ্রহণ এবং সরকারী সেবাপ্রাপ্তিতে অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠনগুলো প্রায়শই সরকারি হস্তক্ষেপ, আইনগত বিধিনিষেধ এবং দমনমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়, যা তাদের কার্যক্রমকে এবং পিছিয়ে পড়া জনগণের কণ্ঠ ও প্রতিনিধিত্বকে বাধাপ্রাপ্ত করে। সমাজের সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠী বিশেষ করে জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এসবের নেতিবাচক ফলাফল সবচেয়ে বেশীভাবে অনুভূত হয়, তাদের জীবনমানের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। নীরব কণ্ঠকে সরব করার সুযোগ সৃষ্টি করে, প্রশাসনিক ও আইনী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাবিত পরামর্শ ও সুপারিশ

অধিকারের আইনী সুরক্ষা ও প্রান্তিক জনগণের ক্ষমতায়ন

- লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, জাতি, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য প্রতিরোধের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনসহ বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে, এবং আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের আইনের আওতায় স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- আইনে উল্লেখিত বিধান (যেমন পারিবারিক সহিংসতা, প্রতিবন্ধী অধিকার, শ্রম আইন, এসিড সুরক্ষা, নারী–শিশু নির্যাতন ও হিজড়া সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার) বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে এবং অধিকারভিত্তিক নাগরিক কার্যক্রমে প্রশাসনিক ও আইনী বাধা দূর করতে হবে।
- আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, দক্ষতা ও বিচার অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আইনী সহায়তার সম্প্রসারণ

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (এনএলএএসও) ক্ষমতা জোরদার করতে হবে।
- নাগরিকদের অধিকার ও আইনী সুবিধা সম্পর্কে সহজলভ্য তথ্য প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আইনী সহায়তা প্রদান সংস্থাসমূহকে সরকার ও সরকার-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অংশীদারত্বের মাধ্যমে আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশাসনিক ও আইনী বাধা দূরীকরণ

- অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে বর্তমানে বিরাজমান প্রশাসনিক ও আইনী প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।
- সাইবার নিরাপত্তা আইন ও বৈদেশিক অনুদান আইনসহ নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্নকারী বিধানগুলো বাতিল বা প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে নাগরিক সংগঠনের সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- নাগরিক সংগঠনগুলো যেন জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়াই কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ

- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সংখ্যালঘু, দলিত ও অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর ভোটার-অধ্যুষিত এলাকায় তাদের নিজস্ব প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ ও নারী আসনে এ গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী যেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের দাবি উত্থাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রান্তিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিশেষ সমস্যাসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদের লক্ষ্যে সরকারি–বেসরকারি সংস্থার কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার (RTI) ব্যবহারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দাবি উপস্থাপন ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা আদায়ের জন্য সম্মিলিতভাবে দর কষাকষির সক্ষমতা ও সুযোগ তৈরি করতে হবে। রাজনীতিবিদদের এ ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

নিয়মিত গণশুনানি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা

- সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির জন্য নিয়মিত গণশুনানি বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ ও জবাবদিহিতা কার্যকর করার অঙ্গীকার করতে হবে।
- কোন নির্বাচনী এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নির্বাচনের পরবর্তীতে যেন জনসমর্থন হারানো জনপ্রতিনিধিকে 'রিকল' (ফেরত আনা) করতে পারে তার বিধান রাখতে হবে।

আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ

- আমলাতন্ত্রের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নে দলগত পছন্দ নয়, পেশাদারি দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সকল নিয়োগ ও পদোন্নতি মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে করতে হবে এবং আমলাতন্ত্রকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে।

বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (জিআরএস) কার্যকারীতা

- বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) শক্তিশালী করতে হবে এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়মিতভাবে নাগরিক সন্তুষ্টির ওপর জরীপ পরিচালনাপূর্বক তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করতে হবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

- ভাল নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য ফলাফল ভিত্তিক প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক, নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্ত ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বিরোধী দলের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল কমিটিগুলো বিরোধীদলের সদস্যদের নেতৃত্বে গঠন করতে হবে। এসব কমিটির কার্যকারিতা নিশ্চিতে সরকারকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।
- সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সরকার গঠন করলে তারা সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (পিএসি), অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক

মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোতে বিরোধীদলের সদস্যদের কমিটি প্রধান হিসেবে নিয়োগ করবে।

অধস্তন আদালতের ওপর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে অধস্তন আদালতগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আদালতগুলোকে পর্যাপ্ত মানবসম্পদ, অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদত্ত সেবার মূল্যায়ন ও বরাদ্দের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রদর্শন এবং তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনগত সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে বার্ষিক অংশীজন সম্মেলন আয়োজন ও সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা

- দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন তদন্ত ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা ক্ষমতাসীন সরকার ও বিভিন্ন সরকারী সংস্থার চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে তাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোন অভিযোগের দ্রুত তদন্ত করতে হবে ও দ্রুত শাস্তি কার্যকর করতে হবে।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।
- দুর্নীতির তদন্ত ও অভিযোগ গঠনে দুদককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। কেউ অভিযুক্ত হলে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের ও রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কেউ যাতে আইনের ব্যত্যয় করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও অপরাধীকে প্রদত্ত শাস্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরটিআই ব্যবহারের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা তথ্য-প্রাপ্তির অধিকার কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্বন্ধে জানতে পারে।

বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশে রুপান্তরের স্বপ্নের বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করবে নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের সক্ষমতা কতটুকু কার্যকর তার ওপর। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য এ কথাটি আরো বেশী সত্য কারণ তারাই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সুশাসন শক্তিশালী করার মাধ্যমেই দেশের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হবে।

ঙ । প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি

বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের একটি বড় অংশের মানুষের কাছে মৌলিক চাহিদা পূরণ অধিকার নয়, বরং আর্থিক সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। কে সুষম খাদ্য গ্রহণ করবে, কে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে, অসুস্থতায় কে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে—তা নির্ধারিত হয় আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে। বিদ্যমান বৈষম্য ও দুর্নীতিমূলক মূলক চর্চাগুলো চলতে থাকলে, স্বাধীন বাংলাদেশের একটি বৈষম্যহীন কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর বিলম্বিত হলে বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জিত হবেনা।

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা দশটি জাতীয় কর্মসূচির প্রস্তাব সামনে রাখছি—যেসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন একটি বৈষম্যহীন, কল্যাণকর এবং সুশাসন যুক্ত রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। এই দশটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উপরে বর্ণিত নাগরিক প্রত্যাশা ও নীতি বিবৃতিগুলোর প্রায়োগিক প্রতিফলন। কর্মসূচিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাদের সামাজিক উত্তরণ, বৈষম্য হ্রাস এবং গতিশীল ও টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করা। একই সাথে কর্মসূচিগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারকে সহায়তা করতে ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত, যেন জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণ "অন্তর্ভুক্তিমূলক" ভাবে তৈরি করা আগামীর বাংলাদেশে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়।

এই কর্মসূচিগুলো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মূলধারার জনগণের কথাও বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে সকল নাগরিকের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত, আবার কিছু কর্মসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে দরিদ্র ও বিপন্ন জনগোষ্ঠী প্রাধান্য পেয়েছে।

এই কর্মসূচিগুলো জীবনচক্র ও জীবিকার বিভিন্ন ধাপকে ঘিরে সাজানো। কোন কর্মসূচি হয়ত বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য। কিছু শ্রমবাজারে প্রবেশরত তরুণদের জন্য। কোনটি নিয়মিত সহায়তা প্রয়োজন এমন বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য। কিছু কৃষক ও গ্রামীণ জীবিকাকে অগ্রাধিকার দেয়। আবার কিছু শহুরে মানুষের জন্য, যারা ন্যূনতম মর্যাদাসম্পন্ন জীবনমান ধরে রাখতে লড়াই করছেন। কিছু কর্মসূচি সরাসরি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য। কিছু দারিদ্র্যপ্রবণ ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেয়। কোন কর্মসূচি সরাসরি নারীদের লক্ষ্য করে প্রস্তাবিত, কারণ এখানে বঞ্চনা প্রায়ই আকস্মিক নয়, বরং কাঠামোগত।

কিছু কর্মসূচি ক্রমবর্ধমান সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত—যার মধ্যে রয়েছে অপুষ্টি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, বেকারত্ব এবং নারীদের শ্রমবাজার থেকে ছিটকে পড়া। অন্যদিকে কিছু কর্মসূচি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহনশীলতা জোরদারে মনোযোগ দেয়, যাতে পরিবারগুলো বারংবার ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে না পড়ে, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে পারে, ঋণ ও আর্থিক সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে যে বাধা তৈরি হয় তা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং সর্বোপরি তাদের সামাজিক গতিশীলতা যেন ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করে। কিছু কর্মসূচি পরিবেশগত ঝুঁকি যেমন শ্রমবাজারের সংযোগহীনতা, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত। কিছু কর্মসূচি শাসনব্যবস্থা ও সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিশেষত যেন সঠিক মানুষকে সঠিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়, অপচয় ও দুর্নীতি কমে, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বাড়ে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সময় অপচয় কমানোর মাধ্যমে ব্যবসার ব্যয় হ্রাস করা যায়, নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডারের আন্তঃসংযোগ বাড়ে এবং সর্বোপরি সরকারি সেবার মান উন্নত ও নির্ভরযোগ্য হয়।

প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ নতুন। কিছু কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমকে পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও টেকসই করার জন্য তৈরি হয়েছে। কিছু কর্মসূচি বহুদিন ধরে আলোচনায় থাকলেও কখনো বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেনি। এ ধরনের কর্মসূচিগুলো আরও সময়োপযোগী, আধুনিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবনাগুলোকে কেবল অভিলাষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বাস্তবায়নে আর্থিক সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে এগুলো তৈরি এবং বাস্তবায়ন কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। দশটি প্রস্তাবিত কর্মসূচি মিলিয়ে বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। এই প্রাক্কলিত ব্যয়ের একটি অংশ বর্তমান ব্যয় কাঠামোর অন্তর্গত প্রকল্পগুলোতে প্রতিশ্রুত আছে। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের সকল নাগরিককেই কোন না কোন ভাবে উন্নত পরিষেবা প্রদানে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অর্থের প্রয়োজন হবে এবং সেগুলো ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করতে হবে। আবার কিছু কর্মসূচির জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হবে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার। এখানে শুধু সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি বরং অধিকতর দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগানোর সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। শ্রমশক্তিই এই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই জনসম্পদ রুপান্তরের মাধ্যমে বাস্তব অগ্রগতি সম্ভব হবে কিনা, তা অনেকটাই নির্ভর করবে প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। আমরা আশা করি আগামী সরকার এই কর্মসূচিগুলো যৌক্তিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দেশের মানুষের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সর্বজনীন ন্যূনতম আয়

বৈষম্য ও ঝুঁকি কমাতে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

- দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য নগদ সহায়তা প্রতি মাসে ৪ হাজার ৫৪০ টাকা
- চাকরির অনিশ্চয়তা, দুর্যোগ ও ঋণ-সেবার সীমাবদ্ধতায় বিপন্ন জনগোষ্ঠী যেন আরও পিছিয়ে না পড়ে
- প্রথম ধাপে ১১ জেলায় ২৮ লক্ষ, দ্বিতীয় ধাপে ৩৬ দারিদ্রপূর্ণ জেলায় ৮০ লক্ষ এবং শেষ ধাপে ৬৪ জেলায় ১৪৭ লক্ষ পরিবার নগদ সহায়তা পাবে; দারিদ্র্য স্কোর কার্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত তালিকা পুনঃমূল্যায়ন হবে প্রতি দুই বছরে।
- ৩৬ টি জেলায় বাস্তবায়নে সরকারের নিজস্ব বাজেটের বরাদ্দে অর্থায়ন- দরকার প্রতি বছরে ৪০ হাজার ৬০০ কোটি (জিডিপির ০.৭৩%)।

সমাজে সকল মানুষ সমান সুযোগ লাভ করে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হবার ক্ষেত্রে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা যেমন আছে তেমনি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সমাজের দরিদ্র নয় এমন পরিবারকেও দারিদ্রসীমার নিচে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন এমন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এর বাইরে থাকে। আবার যোগ্য নয় এমন অনেক পরিবার এ ধরণের সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশে শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থাকলেও ভাতার পরিমাণ এতটাই কম যে এই পরিবারগুলোর বিপন্নতা দূর করতে যথেষ্ট নয়। সর্বজনীন ন্যূনতম আয় এই প্রেক্ষিতে একটি সমাধান হতে পারে। এটি কর্মসংস্থানের শর্ত ছাড়াই নাগরিককে একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা দেয়। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে সর্বজনীন ন্যূনতম আয় পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে সময় লাগবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু করা এখনই জরুরি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, আংশিক ন্যূনতম আয় মডেল একটি আর্থিকভাবে টেকসই সমাধান হতে পারে। এই মডেলে নগদ সহায়তার পরিমাণ নাগরিকের পুরো জীবনযাত্রার ব্যয় নয় বরং মৌলিক চাহিদার একটি অংশ পূরণ করে। প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে একটি চার সদস্যের খানার গড় ভোগব্যয়ের ২৫ শতাংশ সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। নগদ সহায়তার পরিমাণ হবে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এর উচ্চ দারিদ্র্যরেখার সমতুল্য। এই নগদ পরিমাণকে বর্তমান মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করলে প্রস্তাবিত নগদ সহায়তার পরিমাণ হবে খানাপ্রতি মাসে ৪ হাজার ৫৪০ টাকা[1], এবং বার্ষিক মোট ৫৪ হাজার ৪৮০ টাকা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর উপকারভোগীদের যোগ্যতা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে, যাতে কেবল উপযুক্ত খানাসমূহ এ ভাতা পায়।

যেহেতু শুরুতেই এই কর্মসূচির আওতায় পুরো দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়, তাই লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য নিরূপণের জন্য একটি দারিদ্র্য স্কোরকার্ড তৈরি করা হবে। পর্যবেক্ষণভিত্তিক সূচক ব্যবহার করে পরিবারের আয়ের তথ্য না জেনেও এই স্কোরকার্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্যের মাত্রা নিরূপণ এবং লক্ষ্যভুক্ত খানাগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। স্কোরকার্ডে অন্তর্ভুক্ত সূচকগুলো হবে—পরিবারের গঠন সংক্রান্ত (খানায় ৬–১২ বছর বয়সী শিশু ও তাদের স্কুলে উপস্থিতি), আবাসন পরিস্থিতি সংক্রান্ত (বস্তিতে বসবাস, আলাদা খাবার ঘরের ব্যবস্থা, প্রধান কক্ষের নির্মাণসামগ্রী, রান্নায় ব্যবহৃত জ্বালানি), সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত (টেলিভিশন ও পাখা), সামাজিক সহায়তা সংক্রান্ত (সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ) এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা সংক্রান্ত (খানার সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ ও প্রতিবন্ধিতা)। নির্ধারিত একটি সীমা স্কোরের ভিত্তিতে উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা খানাগুলোকে শনাক্ত করা হবে[2]।

সরকারের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে কর্মসূচিটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সর্বনিম্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণে ১১টি অতিদারিদ্র্যপ্রবণ জেলাকে লক্ষ্যভুক্ত করা হবে, যেখানে দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড়ের থেকে বেশি (৪০ শতাংশের ওপরে)[3][4]। এই জেলাগুলোতে প্রায় ২৮.৮ লক্ষ খানা প্রস্তাবিত দারিদ্র্য স্কোর কার্ডের সীমা স্কোরের

[1] ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে।

[2] এই স্কোরকার্ড প্রস্তুতে প্রধান তথ্যসূত্র হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২।

[3] খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর তথ্যের ভিত্তিতে।

[4] ১১টি অতিদারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে—কুড়িগ্রাম, মাগুরা, জামালপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, শেরপুর, দিনাজপুর, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ ও খাগড়াছড়ি।

নীচে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় ধাপে ৩৬টি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাকে লক্ষ্যভুক্ত করা হবে, যেখানে দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড়ের সমান (২৪.৩ শতাংশ)[5]। ফলশ্রুতিতে মোট ৮০.২৫ লক্ষ খানা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশব্যাপী ৬৪ টি জেলায় বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য স্কোরকার্ডের নির্ধারিত সীমার নিচে থাকা প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ খানাকে কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

১১টি অতিদারিদ্র্য প্রবণ জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে মোট অর্থের চাহিদা আনুমানিক ১৫ হাজার ৬৯৪ কোটি টাকা। এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হলে খানাগুলো বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে আসবে। ফলে ওই কর্মসূচিগুলোর আওতায় তাদের জন্য পূর্বে যে অর্থ বরাদ্দ হত তা সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের সাশ্রয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ১১টি অতিদারিদ্র্যপ্রবণ জেলায় উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা উপকারভোগীদের জন্য যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো এখন চালু আছে, সেগুলো বন্ধ করে দিলে সেখানে প্রায় ৮০৫.০৩ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে[6]। এই সাশ্রয় হিসাবেও ধরলে নিট প্রয়োজন দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা। ৩৬টি দারিদ্র্য প্রবণ জেলায় মোট প্রয়োজন ৪৩ হাজার ৭২০ কোটি টাকা; সাশ্রয় বাদ দিলে নিট প্রয়োজন ৪০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। জাতীয় পর্যায়ে ৬৪ জেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে মোট চাহিদা ৮০ হাজার ২০৮ কোটি টাকা; সাশ্রয়ের পর নিট প্রয়োজন ৭৫ হাজার ১৬ কোটি টাকা। জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ থেকে কর্মসূচিটির অর্থায়ন করা হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট বাজেটের অনুপাতে এই প্রাক্কলিত ব্যয়মূল্য জাতীয় পর্যায়ে ৯.৪১ শতাংশ, ৩৬ টি দারিদ্র্য প্রবণ জেলায় ৫.০৯ শতাংশ এবং ১১ টি অতিদারিদ্র্য প্রবণ জেলায় ১.৮৭ শতাংশ। মোট জিডিপির অনুপাতে এই প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে ১.৩৪ শতাংশ, ৩৬ টি দারিদ্র্য প্রবণ জেলাগুলোতে ০.৭৩ শতাংশ এবং ১১ টি অতিদারিদ্র্য প্রবণ জেলাগুলোতে ০.২৭ শতাংশ।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে আট থেকে দশ সদস্যের ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করা হবে। এতে স্থানীয় সরকার, বিরোধী দল, বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, তরুণ প্রতিনিধি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা থাকবেন। কমিটির অন্তত অর্ধেক সদস্য হবেন নারী বা তৃতীয় লিঙ্গের। তারা প্রচার, নিবন্ধন, যাচাই, অন্তর্ভুক্তি, নজরদারি ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে যুক্ত থাকবেন। প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে করা হবে। অর্থপ্রদান পরিচালনা করবে নির্ধারিত মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, নজরদারি ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। সবশেষে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি পুরো কর্মসূচির তত্ত্বাবধান করবে, যাতে সমন্বিত ও কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত হয়। প্রতি দুই বছরে পর্যালোচনা করে এই কর্মসূচির উপকারভোগী খানা নির্বাচন করা হবে।

সীমিত আর্থিক সক্ষমতার কারণে কর্মসূচির বিস্তার ধীর হতে পারে, কিংবা নির্ধারিত সহায়তার পরিমাণ কম হতে পারে। বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় অংশীজনদের সমন্বয় দুর্বল হলে বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে এবং জবাবদিহিতা ঝুঁকিতে পড়বে। দুর্গম এলাকায় নেটওয়ার্ক দুর্বলতা ও অনেক দরিদ্র পরিবারের মোবাইল না থাকায় ডিজিটাল উপায়ে ভাতা প্রেরণ ব্যাহত হতে পারে। যথাযথ সুরক্ষা না থাকলে রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাত উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়ম তৈরি করতে পারে। কর্মসূচিটি কাজের আগ্রহ কমায় ও করে নারীদের গতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে- এমন ধারণা ও পরিস্থিতি তৈরি হলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা দুর্বল হতে পারে।

---

[5] ৩৬টি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে- কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, বান্দরবান, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পটুয়াখালী, নেত্রকোনা, রাজবাড়ী, পাবনা, লক্ষ্মীপুর, নীলফামারী, নওগাঁ, পিরোজপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বাগেরহাট, খুলনা, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর, রাঙামাটি, বরিশাল, বগুড়া, যশোর, ঝিনাইদহ, পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ ও বরগুনা।

[6] ধরা হয়েছে যে দারিদ্র্য স্কোর কার্ডের সীমা স্কোরের নিচে থাকা সব খানা বর্তমানে কোনো না কোনো ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা পাচ্ছে এবং বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে যোগ্য খানাগুলো যে সুবিধা পাচ্ছে, তা জাতীয় পর্যায়ে অনুমান করে হিসাব করা হয়েছে। শিক্ষাবৃত্তি, কৃষি ভর্তুকি এবং দুর্যোগ সহায়তা সাশ্রয় হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে, কারণ এই তিনটি কর্মসূচি ন্যূনতম আয় কর্মসূচির পাশাপাশি আগের মতোই বহাল থাকবে।

বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল

শেখার সাথে ক্ষুধার অবসান

- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জন্য প্রতিদিন এক বেলা পুষ্টিকর খাবার
- ভর্তি, উপস্থিতি ও শ্রেণিকক্ষে শেখার সক্ষমতা বাড়বে, ঝরে পড়া (বিশেষ করে ছাত্রীদের), শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ কমবে
- সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে ১.১৮ কোটি উপকারভোগী শিক্ষার্থী
- বাজেটের বরাদ্দে বছরে প্রায় ৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা দরকার (জিডিপির ০.১৩%)

প্রতিটি শিশুর শিক্ষার ন্যায্য সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু ক্ষুধা ও অপুষ্টি এখনও বাংলাদেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারগুলোর লক্ষ লক্ষ শিশুর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ এবং সামগ্রিক শেখার অভিজ্ঞতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এটি একদিকে শিশুদের শিক্ষাগত অর্জন ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুযোগ সংকুচিত করছে, অন্যদিকে দেশের মানবসম্পদ বিকাশের সামগ্রিক সম্ভাবনাও দুর্বল করছে। "মিড-ডে মিল" কর্মসূচি বিদ্যালয়গামী শিশুদের দৈনিক অন্তত এক বেলা পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করবে। শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শ্রেণিকক্ষে শেখার সক্ষমতা বাড়াবে। পাশাপাশি ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার্থী ধরে রাখার (বিশেষ করে ছাত্রীদের) হার বাড়াবে। শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিও কমবে। ফলে সরকারি বিদ্যালয়গুলো আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক হবে।

বাংলাদেশে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সর্বপ্রথম ২০০১ সালে চালু হয়। প্রকল্পটি সর্বশেষ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলে। এর আওতায় দেশের ১০৪টি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় অবস্থিত ১৫ হাজার ৩০০টিরও বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি তিনটি উপজেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য রান্না করা খাবারও প্রদান করা হত। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার আগে ২০২০ সালে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করার জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী ১৭ হাজার ২৯০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা দেয়া হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরতদের বিদেশ সফরসহ নানা কারণে প্রকল্পটি সমালোচনার মুখে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে ২০২১ সালের জুনে একনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন নাকচ করে। ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৬৫টি উপজেলায় কর্মসূচিটি পুনরায় চালু হয়েছে।

চলমান 'বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল' কর্মসূচি দেশের সকল উপজেলায় কর্মসূচিটির বিস্তার করা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সকল সরকারি মাধ্যমিক ও এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকেও কর্মসূচিটির আওতাভুক্ত করার কথা প্রস্তাব করা হচ্ছে। ১৮০ বিদ্যালয় কার্যদিবসে বান রুটি, পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট, ডিম, ইউএইচটি দুধ এবং মৌসুমি ফল সরবরাহ করা হবে। শিশুপ্রতি দৈনিক খাবারের খরচ পড়বে ৩৯ টাকা[7]। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে রান্না করা খাবারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

সকল উপজেলার সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও এমপিওভুক্ত ৮২ হাজার ৫২২ টি বিদ্যালয়ে সর্বমোট উপকারভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা হবে প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ[8]। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে প্রায় ৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের প্রায় ১.০৪ শতাংশ এবং জিডিপির ০.১৩ শতাংশ। তবে মূল্য পরিবর্তন সাপেক্ষে খাবারের খরচ নিয়মিতভাবে সমন্বয় করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মিড-ডে মিল কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন পরিচালনা করবেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনা দল। পাশপাশি দুইজন স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং দুইজন অরাজনৈতিক নাগরিক প্রতিনিধি থাকবেন। এই কমিউনিটি–ভিত্তিক উদ্যোগ সফল করতে হলে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষা

[7] Dhaka Tribune. (2025, March 29). Govt set to reintroduce midday meal program in April. Dhaka Tribune.
[8] বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিসংখ্যান (এপিএসএস), বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৪ এবং ইনস্টিটিউট, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সার-সংক্ষেপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তথ্যের ভিত্তিতে।

প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা জরুরি। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এর মত আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, তৃতীয়-পক্ষ মূল্যায়ন এবং কারিগরি সহায়তা এই কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক সক্ষমতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ—বৃহৎ পরিসরের ব্যয় দীর্ঘমেয়াদে বহন করা এবং মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী খরচ সমন্বয় করা কঠিন হতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভবপর না হলে ক্রয়, সরবরাহ ও বিতরণে অনিয়ম, নিম্নমানের খাদ্য উপকরণ নির্বাচন এবং উপকারভোগী বাছাইয়ে পক্ষপাতের ঝুঁকি বাড়বে। রান্না করা খাবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা জটিল হতে পারে- রান্নাঘর, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যবিধি, সংরক্ষণ, ও সময়মতো পরিবেশনের সক্ষমতা না থাকলে খাদ্য নিরাপত্তা ও অপচয়ের ঝুঁকি তৈরি হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত না হলে কমিউনিটি তদারকি দুর্বল হবে এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি রাজনৈতিক প্রভাবাধীন থাকলে বাস্তবায়নের বিশ্বাসযোগ্যতা ও টেকসইতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

যুব ক্রেডিট কার্ড

আত্মউন্নয়নে কর্মদক্ষ যুবশক্তি

- ১৮–২৪ বছরের যুবদের জন্য সুদমুক্ত, জামানতবিহীন এককালীন ঋণ- ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ১ বছর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য
- সুবিধাবঞ্চিত যুবদের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টা অর্থের অভাবে ব্যাহত হবেনা- শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও চাকরির আবেদন সংক্রান্ত উচ্চ ব্যয় বহনে সহায়ক হবে
- প্রতি বছর ১ লক্ষ তরুণ সুবিধাভোগী হবে
- বাজেটের বরাদ্দে বার্ষিক ব্যয়- ১০০০ কোটি টাকা (ফেরতযোগ্য) তহবিল এবং ১৩৪ কোটি টাকা সেবাশুল্ক পরিশোধ (জিডিপির ০.০১%)

বাংলাদেশে একদিকে যেমন জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা নেবার সুযোগ আছে তেমনি জনশক্তির অভাবের বিষয়টি প্রায়ই বেসরকারি উদ্যোক্তারা তুলে ধরেন। দুঃখজনক হলো বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত যুবদের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন বেকার। এছাড়াও প্রতি পাঁচ জনে একজন যুবক শ্রমবাজারে বা শিক্ষার সাথে যুক্ত নয়। যুবদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপলব্ধতা বাড়াতে ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সাশ্রয়ী ঋণের সীমিত সুযোগ, কঠোর জামানতের শর্ত, প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও যুবদের উচ্চঝুঁকির গ্রাহক হিসেবে দেখার মানসিকতা সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সহ) এবং বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ যুব শ্রমশক্তি গড়ে তোলা অনস্বীকার্য।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রবর্তন করা হচ্ছে "যুব ক্রেডিট কার্ড"- একটি লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক সেবা, যা যুবদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উচ্চ ব্যয় বহনে সহায়তা করবে। এতে যুবগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা, কর্মসংস্থানযোগ্যতা, উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়বে।

এই কর্মসূচির আওতায় ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবদের জন্য সম্পূর্ণ সুদ ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। একজন যোগ্য আবেদনকারী এককালীন সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন, যা এক বছর পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য থাকবে। এই অর্থ কেবল সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় করা যাবে যেমন- শিক্ষা-সংক্রান্ত খরচ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে চাকরির আবেদন ফি পরিশোধ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ ভ্রমণ, ল্যাপটপ কেনা ইত্যাদি। প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধে ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে। এক বছরের রেয়াতকাল শেষে ঋণগ্রহীতারা ৫০টি সুদমুক্ত মাসিক কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করবেন। পরিশোধের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণগ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্র-সমন্বিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা প্রশাসনিক জটিলতা কমাবে এবং অর্থ ফেরতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াবে।

প্রতি বছর এক লক্ষ যুবকে এবং পাঁচ বছরে মোট পাঁচ লক্ষ যুবকে ১ লক্ষ টাকার ক্রেডিট সীমা প্রদান করা হবে। এর ফলে প্রতিবছর প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার ফেরতযোগ্য তহবিল দরকার হবে। পাঁচ বছরে ২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে তহবিলের সেবা শুল্ক বাবদ আরও প্রায় ৫২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ প্রাক্কলিত খরচ হবে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে পাঁচ বছরে মোট ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৫ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি বছর ব্যয় হবে ১ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ০.০৮ শতাংশ এবং জিডিপির ০.০১ শতাংশ। জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ থেকে কর্মসূচিটির অর্থায়ন করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন ব্যবস্থার সহায়তা থাকবে।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হবে একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে। বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে, যা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় তারল্য এবং আর্থিক তদারকি বজায় রাখবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রধান বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কার্যকরী নির্দেশিকা প্রণয়ন, উপকারভোগীর যোগ্যতা যাচাইকরণ এবং

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন তত্ত্বাবধান করবে। দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং নতুন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ, যুব ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, অর্থ বিতরণ এবং পরিশোধ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে। এর ফলে যুবদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহকও বাড়বে। সোনালি ব্যাংক বার্ষিক ২ শতাংশ হারে সেবা শুল্ক পাবে। গ্রাহকের অন্য ব্যাংক হিসাব থেকে কিস্তির অর্থ কেটে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি করা হবে। সম্ভাব্য খেলাপির ঝুঁকি থেকে তহবিলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, তহবিলের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিতে সার্বভৌম গ্যারান্টি প্রদান প্রয়োজন হতে পারে। ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থায় প্রতিটি সুবিধাভোগীর জন্য একটি অনন্য শনাক্তকারী নম্বর নির্ধারিত হবে। এটি জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ফলে ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে ট্র্যাক করা যাবে। নিয়মিত স্বাধীন নিরীক্ষা স্বচ্ছতা এবং কর্মসূচির লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

প্রাথমিকভাবে কর্মসূচিটি পাঁচ বছর মেয়াদী হবে। এই ধাপে সরকার কার্যক্রমের বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই করবে। ডিজিটাল মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম আরও শক্তিশালী করা হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সোনালী ব্যাংকের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা স্থিতিশীল হলে কর্মসূচিটি দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর সুযোগ থাকলে বার্ষিক উপকারভোগীর সংখ্যাও ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে।

উপকারভোগী নির্বাচন, ঋণ অনুমোদন ও ব্যয় যাচাই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হলে কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। তারল্য সংকটের কারণে সময়মতো অর্থ ছাড় ও পুনঃঅর্থায়ন বিঘ্নিত হলে উপকারভোগীরা সময়মত প্রশিক্ষণ-শিক্ষা ব্যয় মেটাতে ব্যর্থ হবেন। অনাদায়ী ঋণের হার উচ্চ হলে ভবিষ্যত বরাদ্দ ও সম্প্রসারণ-দুটিই বাধাগ্রস্ত হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড

চিকিৎসা ব্যয়ের দুশ্চিন্তার প্রতিকার, প্রতিটি জীবনের নিরাপত্তা

- স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করলে কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না- পরিবার প্রতি বছরে ১ লক্ষ টাকা মূল্যমানের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ
- জরুরি চিকিৎসা আর টাকার অভাবে স্থগিত থাকবেনা, উপকার পাবে দরিদ্র, বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, চিকিৎসার খরচে আর কেউ সর্বস্বান্ত হবে না
- প্রথম ধাপে আওতাভুক্ত হবে ৬১ লক্ষ বয়স্ক ভাতাভোগীর পরিবার
- বাজেটে অর্থায়ন- বার্ষিক ব্যয় সর্বোচ্চ (ব্যবহারের উপর নির্ভর করে) ৬১ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ১%)

একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও, এখনও বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় অর্থ পরিশোধের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নিজ পকেটের ব্যয় (৭২.৫৩ শতাংশের বেশি)[9]। ২০২৫ সালে প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিজস্ব খরচে স্বাস্থ্যব্যয় বহন করতে গিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছেন[10]। আর্থিক সীমাবদ্ধতায় বিশেষ করে দরিদ্র ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী, সময়মত জরুরি চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন না। অনেককেই বিশেষ চিকিৎসা বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য ঋণ নিতে হয়। চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে অনেক মানুষ তাদের সম্পদ পর্যন্ত বিক্রি করেন। বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, প্রতিটি খানায় জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা আমাদের প্রস্তাবনা। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পেতে নাগরিকের অর্থনৈতিক অবস্থান যেন বাধা হিসেবে না দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করা এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে একটি বায়োমেট্রিক স্মার্ট স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হবে, যা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করলে সুবিধাভোগীকে কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। নিবন্ধিত স্বাস্থ্য কার্ডের বিপরীতে উপকারভোগী বছরে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা মূল্যমানের চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। হাসপাতালে ভর্তি, রোগ নির্ণয় পরীক্ষা, জরুরি অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ঔষধ কেনা এবং চিকিৎসা পরবর্তী ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা এই কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে পরিকল্পিত ঐচ্ছিক সেবাসমূহ যেমন- কসমেটিক সার্জারি, দন্ত চিকিৎসা, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা ও উচ্চমূল্যের পরীক্ষামূলক ঔষধ কেনা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রথম ধাপে কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে বিদ্যমান বয়স্ক ভাতার উপকারভোগীদের তালিকা ব্যবহার করা হবে এবং তালিকাভুক্ত ৬১ লক্ষ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের খানাকে এই সুবিধার আওতায় আনা হবে। দ্বিতীয় ধাপে বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য নিম্ন-আয়ের ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি নির্বাচিত খানার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তাদের প্রত্যেকের জাতীয় পরিচয়পত্র ডিজিটাল তথ্যভান্ডারে যুক্ত থাকবে। ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বজনীন আওতাভুক্তি এই কর্মসূচির সর্বোচ্চ উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত সকল সরকারি ও নির্দিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হবে। যোগ্য আবেদনকারী যে কোন সরকারি ও চুক্তিভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে যাচাইকরণ নথি (যেমন- বয়স্ক ভাতা কার্ড বা জাতীয় পরিচয় পত্র) প্রদর্শন করলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিবন্ধন কাউন্টার স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য কার্ড তৈরি করতে সাহায্য করবে। এই কার্ড কর্মসূচির আওতাভুক্ত সকল হাসপাতলে ব্যবহার করা যাবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগের উদ্যোগে একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ক্লেইমস প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বকেয়া বিল সরাসরি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রতিপূরণ করা হবে।

[9] National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, The World Bank. (n.d.). Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure): Bangladesh [Data set]. World Development Indicators. Retrieved December 28, 2025

[10] World Health Organization. (2025, December 12). Bangladesh moves forward on universal health coverage: WHO hosts technical consultation on UHC roadmap 2026–2035. WHO.

খানাপ্রতি সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা ধরে ৬১ লক্ষ বয়স্কভাতাভোগী সদস্যের খানার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যয় হবে ৬১ হাজার কোটি টাকা। এই ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৭.৬৫ শতাংশ এবং জিডিপির ১ শতাংশ। তবে দাবি হারের উপর নির্ভর করে প্রকৃত ব্যয় আরও কম ও হতে পারে। এর পাশাপাশি স্মার্ট-কার্ড নিবন্ধন, ডিজিটাল ক্লেইমস প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকা এককালীন বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ আনুমানিক বার্ষিক খরচ স্বাস্থ্যখাতের নিয়মিত খরচের আওতায় পড়বে। এই কর্মসূচির অর্থায়ন প্রধানত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আসবে। আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ডিজিটাল ক্লেইমস প্ল্যাটফর্ম চালুর জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা দুর্বল হলে প্রয়োজনীয় বাজেট, নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং প্রতিষ্ঠানগত সমন্বয় সম্ভবপর হবে না। দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা না গেলে হাসপাতাল বিল যাচাই এবং ক্লেইমস পরিশোধে অনিয়ম ঘটতে পারে, যা ব্যয় বাড়াবে এবং কর্মসূচির প্রতি আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বেসরকারি হাসপাতালের সাথে চুক্তি স্বচ্ছ ও মান-নির্ধারিত না হলে অতিরিক্ত বিলিং, সেবার মান বৈষম্য, এবং প্রতিপূরণ জটিলতায় সেবা প্রদান ব্যাহত হতে পারে।

কৃষক স্মার্ট কার্ড

কৃষকের চাহিদামতো কৃষি প্রণোদনা

- শস্য খাতের সকল প্রকৃত কৃষকের জন্য স্মার্ট কার্ড- সেবা বন্টন হবে আবেদনের প্রেক্ষিতে ও লটারির মাধ্যমে
- প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ কৃষি পরিবার (নারী ও পুরুষ উভয়ই)
- সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছাবে প্রকৃত কৃষকের কাছে, কমবে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়, প্রণোদনার চাহিদার ধারণা মিলবে
- "পার্টনার" প্রকল্প পরিমার্জনে হবে বাস্তবায়ন (নতুন বরাদ্দ নেই)- ডিজিটাল কৃষি সম্প্রসারণ সেবা ও ই-ভাউচার ভর্তুকি বাস্তবায়নে বার্ষিক বরাদ্দ প্রায় ১৫৯ কোটি টাকা (জিডিপির ০.০০২%)

কৃষকদের ভর্তুকিমূল্যে উপকরণ ও বিভিন্ন সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দিতে সরকার প্রায় দুই দশক আগে কৃষি কার্ড চালু করেছিল। কিন্তু সীমিত বরাদ্দে সেবার অপ্রতুলতা থাকায় বহুদিন ধরে কার্ড বিতরণ স্থগিত রয়েছে এবং কৃষি প্রণোদনার উপকারভোগী নির্বাচনে এখন আর কৃষি কার্ড দেখে যোগ্যতা যাচাই করা হয় না। প্রণোদনা পাওয়া উপকারভোগীদের কোনো তালিকাও প্রকাশ করা হয় না। সঠিক তালিকা না থাকায় কৃষি সম্প্রসারণ সুবিধা বণ্টনে বড় ধরনের অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি ঘটে, আবার অসামঞ্জস্যতা যাচাই করারও সুযোগ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের ভোটব্যাংক রক্ষার জন্য কৃষি উপকরণের একটি অংশ ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশকৃত মানুষের মধ্যে বিলি করতে চাপ সৃষ্টি করেন, যাদের অনেকে প্রকৃতপক্ষে কৃষক নন। অনেক কৃষক আবার প্রণোদনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সম্পর্কে জানতেই পারেন না। ফলে প্রকৃত কৃষক ন্যায্যমূল্যে উপকরণ না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং তাদের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

কৃষি আধুনিকীকরণ, তথ্যের সহজলভ্যতা ও ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি খসড়া কৃষক স্মার্ট কার্ড নীতিমালা (কেএসসি) ২০২৫[11] প্রস্তুত করেছে। এই নীতিমালায় কৃষকদের একটি ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করে ই-ভাউচারের মাধ্যমে সরকারি ভর্তুকি (সার, বীজ, কীটনাশক) ও অন্যান্য কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সমন্বিত কৃষক ডেটাবেজ তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর ও কৃষকের চাহিদাভিত্তিক করতে আমাদের কিছু বাস্তবমুখী প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট সংখ্যক কার্ড দেওয়ার পরিবর্তে সকল কৃষককে (শস্য খাত) স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হবে। কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই কার্ড দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত, সুপারিশে নয়, আবেদনের প্রেক্ষিতে ভর্তুকি বন্টণ করা হবে। কৃষকেরা আসন্ন মৌসুমে কোন ফসল চাষ করবেন, জলবায়ু সহনশীল উপকরণের প্রয়োজন আছে কি না—এসব চাহিদা অ্যাপের মাধ্যমে অথবা ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রে জানাতে পারবেন। এসব তথ্য অ্যাপের রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হবে এবং কৃষকের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বিবেচনায় সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে। এই মতামত ব্যবস্থা একই সঙ্গে অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবেও কাজ করবে, যেখানে কৃষকেরা সুবিধা বণ্টনে অনিয়মের কথা তাৎক্ষনিক ভাবে জানাতে পারবেন। তৃতীয়ত, একই ব্যক্তি যেন বারবার সুবিধা না পান, সে জন্য উপকারভোগীদের তালিকা পালাক্রমে পরিবর্তন করা হবে এবং লটারি পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হবে। চতুর্থত, অ্যাপের বা মুঠোফোন বার্তার মাধ্যমে প্রণোদনা প্রাপ্যতার তথ্য কৃষকদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া হবে। এই দ্বিমুখী তথ্য প্রবাহ কৃষি অধিদপ্তরকে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদা বুঝতে সহায়তা করবে এবং সম্প্রসারণ সেবায় অপব্যবহার ও ভুল বণ্টনের ঝুঁকি কমাবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্মার্টকার্ড নিবন্ধন, ভর্তুকি বিতরণ বা ডেটাবেজ তৈরি পর্যন্ত সকল ধাপই কৃষক স্মার্ট কার্ড নীতিমালার আওতাভুক্ত। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২৩-২০২৮ মেয়াদে "প্রোগ্রাম অন অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, আন্ত্রেপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স (পার্টনার)" কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক স্মার্ট কার্ড ও ই-ভাউচারের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে[12]।

11 কৃষক স্মার্ট কার্ড নীতিমালা (কেএসসি) ২০২৫

12 World Bank. (2023). Bangladesh – Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh (Document No. 099041023160013487). World Bank.

এই প্রকল্পের অধীণে ৪৯৫টি উপজেলায় ডিজিটাল কৃষি সম্প্রসারণ সেবা দেওয়া হবে এবং ১৫টি উপজেলায় ৫০ লক্ষ কৃষককে ই-ভাউচার ভর্তুকি পাইলট কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি কৃষি স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, ভর্তুকি ও ঋণ সুবিধা পাবে। চলমান প্রকল্প সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব। এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ প্রায় ৭৯৪ কোটি টাকা (৬.৫ কোটি মার্কিন ডলার)। ব্যয় বহন করবে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংকের আওতাধীন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারী অংশীদাররা। এর বাইরে কৃষক মতামত ব্যবস্থা ইন্টারফেজ গড়ে তুলতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবার কথা নয়। এই সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে ভর্তুকির অপব্যবহার কমানো ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদানের ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল অর্জিত হবে। স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পের আওতায় আগে একটি অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল[13]। এতে ১ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষককে ডিজিটাল আইডি ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের পরিকল্পনা ছিল। উদ্যোগটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, কৃষি শুমারি ২০১৯ অনুযায়ী সারাদেশে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ কৃষি পরিবার আছে।

স্মার্ট কার্ড ও অ্যাপ ব্যবহারে ডিজিটাল দক্ষতার ঘাটতি, দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ এবং তথ্য হালনাগাদের বিলম্ব কৃষকদের অংশগ্রহণ কমাতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রভাব ভর্তুকি বণ্টনের স্বচ্ছতা ব্যাহত করতে পারে। সর্বশেষ, ডেটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ ও তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে অপব্যবহার ও আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে।

13 Prothom Alo. (2022, February 8). ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পাবেন স্মার্ট কার্ড [1 crore 62 lakh farmers will receive smart cards]. Prothom Alo.

জাতীয় শ্রমবাজার তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্ম

সংযুক্ত শ্রমবাজার, কর্মসুযোগের নতুন দিগন্ত

- জাতীয় চাকরি প্ল্যাটফর্ম- সব পেশার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দেশে ও বিদেশে চাকরি খোঁজা, পরামর্শ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা
- চাকরিদাতা এবং চাকরিপ্রার্থীর সংযোগ স্থাপনে; যুক্ত হবে সকল চাকুরি প্লাটফর্ম, গ্রামীণ ও শ্রমজীবী গোষ্ঠীর জন্যও চাকরির তথ্য হবে সমানভাবে সহজলভ্য; বাড়বে শ্রমের গতিশীলতা; সহজ হবে অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন
- উপকারভোগী হবেন ৭.১৭ কোটি মানুষের শ্রমশক্তির মধ্যে যারা কাজ খুঁজছেন (মূলত যুব)
- সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন- সরকারের প্রাথমিক ব্যয় ১০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.০০০১%)

বাংলাদেশে চাকরিদাতা এবং চাকরিপ্রার্থী সংযুক্ত হবার প্রক্রিয়া এখনো বিচ্ছিন্ন এবং মূলত বেসরকারি নিয়োগ পোর্টাল ও অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। অনেক চাকরিপ্রার্থী নির্ভরযোগ্য এবং হালনাগাদ চাকরির তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকেন। বিশেষ করে শ্রমজীবী পেশায় নিয়োগের বড় অংশ হয় মুখে-মুখে খবর বা ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে, ফলে এই নেটওয়ার্কের বাইরে থাকা প্রার্থীরা উপযুক্ত হলেও সুযোগ পান না। বেসরকারি নিয়োগ পোর্টালগুলো শহরকেন্দ্রিক পেশাজীবীদের জন্য তৈরি হওয়ায় গ্রামীণ যুব ও অনানুষ্ঠানিক খাতের স্বল্প আয়ের চাকরিপ্রার্থীরা উপেক্ষিত থাকেন। গ্রামীণ এলাকায় দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ এবং অনলাইনভিত্তিক পোর্টাল ব্যবহারে উচ্চ ডেটা খরচ এ সকল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সুযোগ আরও সীমিত করে। নারীরা নির্ভরযোগ্য কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া ও আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বাধার মুখে পড়েন। নিয়োগদাতাদের দিক থেকেও চ্যালেঞ্জ কম নয়। যেহেতু অনলাইনে যে কেউ সহজে আবেদন করতে পারে, তাই অযোগ্য বা অনাগ্রহী আবেদনকারীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। এতে নিয়োগদাতারা অপ্রাসঙ্গিক আবেদন ও তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীর হয়। উপরন্তু, বেসরকারি নিয়োগ পোর্টালগুলোর ফি-ভিত্তিক ব্যবস্থা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে। অভ্যন্তরীণ শ্রম গতিশীলতার অভাব এই সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তোলে। যার ফলে উদ্বৃত্ত শ্রম সহজে ঘাটতিমূলক খাত ও অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে পারে না এবং গার্মেন্টস, নির্মাণ খাতের মত শ্রমনিবিড় খাতে স্থায়ী শ্রমিক সংকট সৃষ্টি হয়।

এই প্রেক্ষিতে সরকার পরিচালিত একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল শ্রমবাজার তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্ম প্রস্তাব করা হচ্ছে যা নাগরিককে সহজেই কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। যুক্তরাজ্যের "জবসেন্টার প্লাস" ও নাইজেরিয়ার "ন্যাশনাল জব সেন্টার" মডেল অনুসরণে এই কর্মসূচিটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির নির্ধারিত সুবিধাভোগী হবে শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজছেন এমন মানুষ, যারা মূলত যুব। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থী বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামীণ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে নির্ভরযোগ্য কর্মসংস্থান তথ্য ও পেশাদার সহায়তা পাবেন। স্নাতকপ্রাপ্ত, কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের নিম্ন আয়ের চাকরিপ্রার্থী সমানভাবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি নিয়োগদাতারা আরও বিস্তৃত ও দক্ষ শ্রমভাণ্ডার থেকে প্রার্থী বাছাই করতে পারবেন এবং দ্রুত ও কম খরচে শূন্যপদ পূরণ করতে পারবেন।

এই উদ্যোগের কেন্দ্রে থাকবে একটি ন্যাশনাল ভেরিফায়েড এমপ্লয়মেন্ট ডেটাবেজ যেখানে নিরাপদভাবে চাকরিপ্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা হবে। সংরক্ষণের পূর্বে প্রার্থী প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের তথ্য যাচাই করা হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে। নিয়োগদাতারা বিনা খরচে তাদের প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য সরাসরি ডেটবেজে প্রদান করতে পারবেন। নিয়োগদাতার যাচাইকৃত প্রোফাইল, শ্রম চাহিদার তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে। বিদ্যমান বেসরকারি নিয়োগ পোর্টালগুলোর সঙ্গেও ডেটাবেজটির সমন্বয় করা হবে।

তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় জব পোর্টাল হিসেবে কাজ করবে। ওয়েব ও মোবাইল থেকে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করা যাবে এবং বিনামূল্যে নিবন্ধন, দক্ষতা–ভিত্তিক ম্যাচিং এবং শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগদাতারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন ও আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সহায়তা পাবেন।

বিদ্যমান উপজেলা যুব অফিসগুলোতে লেবার এক্সচেঞ্জ ইউনিট করা হবে, যেগুলো হবে একেকটি কর্মসংস্থান সেবা কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগদাতাদের জন্য পেশাদার পরামর্শদাতা থাকবেন। পরামর্শদাতারা এমপ্লয়মেন্ট ডেটাবেজ ব্যবহার করে প্রার্থীর দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে চাকরির সুযোগ খুঁজে দেবেন। তারা আবাসন, পরিবহণ , অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলোকে এ কাজে যুক্ত করা যাবে। একই সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সেবাপ্রদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (রিক্রুটিং এজেন্সি) এই প্ল্যাটফর্মে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত হবেন। বর্তমানে থাকা বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্ল্যাটফর্মের এর সাথে যুক্ত হবে।

যুবদের দক্ষতা বাড়াতে কেন্দ্রগুলোতে সিভি লেখা, চাকরির আবেদন ও ইন্টারভিউ প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যারিয়ার নির্দেশনা ও প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ রেফারেল করা হবে। কেন্দ্রগুলোর উদ্যোগে চেম্বার অব কমার্স ও শিল্প সমিতির সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হবে। অন্যান্য স্থানীয় ও খাতভিত্তিক চাকরি মেলার তথ্যও কেন্দ্র থেকে জানা যাবে। যারা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চান, পরামর্শদাতা তাদের ব্যবসার ধারণা শুনবেন এবং ব্যবসার সম্ভাবনা যাচাইয়ে সহায়তা করবেন। পাশাপাশি কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন সহায়তা পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করবেন।

পেশাদার পরামর্শদাতা নিয়োগদাতাদের চাকরির বিবরণ তৈরি করতে সহায়তা করবেন। পাশাপাশি কেন্দ্রে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রচারে সহায়তা দেবেন। নিয়োগদাতাদের চাকরি মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ডেটাবেজ ব্যবহার করে আবেদন যাচাই ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়েও সহায়তা দেওয়া হবে। উপজেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচিটি পরিচালনা করা হবে।

উক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন ধাপে ধাপে এগোবে। প্রথম বছরে দেশের যে সকল উপজেলায় বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ সে সকল উপজেলায় যুব অফিসে লেবার এক্সচেঞ্জ ইউনিট স্থাপন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সক্রিয়করণ এবং কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। প্রথম বছরেই লক্ষ্য থাকবে সিস্টেম ও প্ল্যাটফর্ম স্থিতিকরণ এবং অন্তত এক লক্ষ চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগদাতাকে নিবন্ধন করা। পরবর্তী বছরে কর্মসূচিটি সারাদেশে বিস্তৃত করা হবে এবং দেশের শ্রমবাজারকে তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্মের সাথে পুরোপুরি একীভূত করা হবে। কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হলে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা সাময়িক নীতি প্রনোদনা (যেমন ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার) পেতে পারবেন। এই সহায়তা সক্রিয় চাকরি খোঁজা ও কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্তে দেওয়া হবে।

ব্যয়ের বড় অংশ যাবে ভেরিফায়েড ডেটাবেজ ও তথ্য বিনিময় প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা, লেবার এক্সচেঞ্জ ইউনিট স্থাপন, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও চাকরি মেলার আয়োজনে। ডিজিটাল উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে a2i প্রকল্পটি চালু হয়। ২০০৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১ হাজার ৩৭ কোটি টাকা[14]। কর্ম পরিধি বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটির জন্য সরকার প্রাথমিক ভাবে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিবে। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এফবিসিসিআই-এর মাধ্যমে যুক্ত করে সকল ব্যাক্তি খাতের এ্যাসোসিয়েশনকে যুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপ তৈরির দায়িত্ব বেসিস-কে দেয়া যেতে পারে। সফলতা আর বাজেটের সক্ষমতার ভিত্তিতে সারাদেশে কর্মসূচিটি সম্প্রসারণ করা হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মত ক্ষেত্রগুলো এবং সরকারি সকল কর্মসংস্থান বাধ্যতামূলকভাবে এ প্লাটফর্মে যুক্ত করার বিধান করতে হবে। এই প্লাটফর্ম চালু হলে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে চাহিদা ও যোগান দুই ক্ষেত্রেই তথ্য সংগ্রহ, এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং সে অনুযায়ী নীতিনির্ধারণ করা সহজ হবে।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিখাতে সদিচ্ছার অভাব। বেসরকারি ও অনানুষ্ঠানিক খাতের নিয়োগদাতাদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে প্রত্যাশিত ফল অর্জন করা সম্ভব হবেনা। অন্যদিকে,

[14] https://en.prothomalo.com/bangladesh/a7927pllza,
Bangladesh: Access to Information (A2I) Evaluation
Access to Information (a2i-II) Programme Final Project Review Report

যুব উন্নয়ন অফিস ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণের সেবার মানে তারতম্য কর্মসূচির কার্যকারিতা বিঘ্নিত করতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ডেটাবেজে নিয়মিত তথ্য আপডেট ও যাচাইকরণে একনিষ্ঠতা ও ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কর্মজীবী নারীদের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুর নিরাপদ শৈশব, মায়ের উদ্বেগহীন কর্মক্ষেত্র

- ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে ৪০০টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন
- কর্মজীবী অভিভাবকদের সহায়তা; শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও আর্থিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি
- ৪০০ টি দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিম্নআয়ের শ্রমিক (মূলত শিল্পে কর্মরত) মায়েদের ২৪ হাজার শিশুকে (সপ্তাহে ৬ দিন, ১০ ঘণ্টা) সেবা দেয়ার সক্ষমতা
- সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে অর্থায়ন- বাস্তবায়ন ব্যয় প্রায় ২১২ কোটি টাকা (জিডিপির ০.০০৫%)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, ৫৪ শতাংশের বেশি কর্মজীবী পিতামাতা বিশ্বাস করেন যে সাশ্রয়ী শিশু যত্নকেন্দ্রের অভাব নারীদের পেশাগত উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে[15]। শিশুর প্রাথমিক যত্নকর্তা হিসেবে একই সাথে একজন মা এবং পেশাদার কর্মজীবীর দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে নারীরা বাড়তি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। কাজের কারণে শিশুর যত্নে ঘাটতি হবে- এই দুশ্চিন্তায় অনেক নারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন বা সন্তান জন্মের পর কাজ চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত হন। কাজে আসলেও কর্মজীবী মায়েরা সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। এই সমস্যাটি শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এলাকার নারীদের জন্য আরও প্রকট, যেখানে অধিকাংশ পরিবার একক পরিবার ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে এবং শিশুর পরিচর্যার জন্য নারীরা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের উপর নির্ভর করতে পারেন না। আবার, ধনী পরিবারগুলোর মতো, ব্যক্তিগত পরিচর্যাকারী ভাড়া করার সামর্থ্যও তাদের নেই। শহরাঞ্চলে সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন দিবাযত্ন কেন্দ্র শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ ও তাদের উপযুক্ত বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে। একই সাথে এটি নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে সহায়তা করবে।

শিল্পখাতে প্রায় ২০ লক্ষ নারী কর্মরত আছেন[16] এবং এই নারীদের ৩৬ শতাংশেরও[17] বেশি ঘরে সন্তান রেখে কাজে যান। এই উদ্যোগটি বাংলাদেশের চারটি প্রধান শিল্প জেলায় নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্মজীবী নারীদের জন্য প্রস্তাবিত। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, এবং চট্টগ্রাম- প্রতিটি জেলায় ১০০টি করে মোট ৪০০টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কমিউনিটি-ভিত্তিক দিবাযত্ন কেন্দ্রে ১০০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করার সক্ষমতা থাকবে। পরবর্তীতে এই উদ্যোগটি পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য শিল্প এলাকা ও অঞ্চলেও ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করা হবে। একই সঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরও বেশি শিশুকে সেবার আওতায় আনা হবে। দিনে ১০ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ৬ দিন দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো খোলা থাকবে, যা সাধারণত শিল্পকারখানার কর্মঘণ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্র সক্রিয়করণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য এককালীন প্রায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। নিয়মিত পরিচালন ব্যয়- যেমন পরিচর্যাকারীর বেতন, কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভাড়া বাবদ প্রতি বছর আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা লাগবে। উপকারভোগী মায়েরা শিশুদের জন্য খাবার সরবরাহ করবেন। উপকারভোগী অভিভাবক প্রতি মাসে ৫০০ টাকা সেবা শুল্ক দেবেন, যা অন্যান্য খরচ মেটাতে সহায়তা করবে। এতে উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। সব মিলিয়ে মোট ব্যয় হবে প্রায় ২১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, যা ২০২৫–২৬ অর্থবছরের মোট বাজেটের প্রায় ০.০৫ শতাংশ এবং জিডিপির মাত্র ০.০০৫ শতাংশ।

কর্মসূচিটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং মায়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি ত্রিপক্ষীয় মডেল অনুসরণে পরিচালিত হবে। একাধিক দক্ষ এনজিও-কে এক্ষেত্রে দায়িত্ব দেয়া হবে (অতীতে নগরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অনুরূপ অংশীদারিত্ব

[15] International Labour Organization. (2024, November 25). Government of Bangladesh launch Roadmap for Childcare in Bangladesh. https://www.ilo.org/resource/news/government-bangladesh-launch-roadmap-childcare-bangladesh

[16] Bangladesh Bureau of Statistics. (2025). Labour force survey 2024 full report [PDF]. Bangladesh Bureau of Statistics.

[17] Bangladesh Bureau of Statistics. (2022). Labour force survey 2022 [Dataset]. Bangladesh Bureau of Statistics.

মডেল অনুসরণ করা হবে)। সরকার দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনায় প্রয়োজনীয় ব্যয় (যেমন ভাড়া এবং মৌলিক সরঞ্জাম ক্রয়) বহন এবং সার্বিক তদারকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। নিয়মিত পরিচালন ব্যয় (যেমন পরিচর্যাকারীর বেতন ও কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের) বহনে বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে অর্থ যোগান দিবে। কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ নারী এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক সহযোগীরা কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যোগ্য পরিচর্যাকারী নির্বাচন, সঙ্গতিপূর্ণ শিশু-সেবা প্রদানকারী অনুপাত রক্ষা এবং সার্বিকভাবে সেবার মান বজায় রাখা সম্ভব না হলে উদ্যোগটির কার্যকারিতা ব্যাহত হবে। নিয়মিত অর্থায়ন নিশ্চিত করা না গেলে কেন্দ্রগুলোর দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা বিপন্ন হতে পারে। এছাড়া, কর্মজীবী মায়েদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এই সেবার ব্যবহার সীমিত করতে পারে।

নগরাঞ্চলে সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা

নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবায় নগর আধুনিকায়ন

- নগরে সরকার নিয়ন্ত্রিত ও ফ্র্যাঞ্চাইজ ভিত্তিক বাস ব্যবস্থাপনা- একটি রুটে একাধিক কোম্পানির বাস নয়, সরকার-বাসমালিকের যৌথ মালিকানা, চালক ও সহকারীরা হবে বেতনভুক্ত কর্মচারী
- যানজট, বাসগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, বাসের রুট, স্টপেজ, ও ভাড়া সংক্রান্ত অনিয়ম থেকে প্রতিকার
- উপকার পাবেন নগরের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগণ
- চলমান বিদেশি ঋণযুক্ত প্রকল্প পরিমার্জন সাপেক্ষে বার্ষিক ব্যয় ৪০০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.০০৬%)- প্রয়োজন হবে শুল্ক এবং ঋণ প্রণোদনা এবং ব্যক্তিখাতের সাথে অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশের ব্যস্ত নগরগুলোতে গণপরিবহণ ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছানো নগরবাসীর জন্য এক নিত্য যুদ্ধ। বেসরকারি খাতের একচেটিয়া আধিপত্য, অসহযোগিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনের তুলনায় গণপরিবহনের সংখ্যা কম হওয়ায় যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হন। বাসের রুট, স্টপেজ, ও ভাড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, যার কারণে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া, অপ্রীতিকর আচরণ ও বেপরোয়া চালনা প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রেই ভাড়ার কোনো নির্ধারিত তালিকা নেই, ফলে চালক ও সহযোগীরা নিজেদের ইচ্ছামতো ভাড়া আদায় করে। বাসের চলাচলযোগ্যতা, নিরাপত্তা, ও চালকদের প্রশিক্ষণ অপ্রতুল, ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে এবং যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। এই অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত ব্যবস্থা শুধু জীবন ঝুঁকিতে ফেলে না, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নগর বাসযোগ্যতায় প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রয়োজন একটি সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা যেখানে সব বাস এককভাবে সরকারি কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হবে। এর ফলে নগরের (সিটি কর্পোরেশন এলাকার) নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত জনগণ উন্নত মানের গণপরিবহণ সেবা পাবেন পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে।

প্রস্তাবিত 'নগরাঞ্চলে সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা' উদ্যোগ অনুযায়ী বাস মালিকদের কোন পৃথক রুট পারমিট প্রদান করা হবে না বরং বিদ্যমান স্বতন্ত্র বাস কোম্পাগুনিলোকে অবলুপ্ত করে একটি নগরভিত্তিক কেন্দ্রীয় বাস ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আওতায় সকল বাস নিয়ন্ত্রিত হবে। সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থার আওতায় বাস চালানোর জন্য বেসরকারি বাস কোম্পানিগুলো আবেদন করবে এবং যাচাইবাছাইয়ের ভিত্তিতে বাস কোম্পানিভুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস কোম্পানিগুলো অগ্রাধিকার পাবে। বাস কোম্পানিগুলোর আয় যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করবে না বরং আয় সমানভাবে ভাগ হবে। বাস চালক ও সহকারীরা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার বেতনভুক্ত কর্মচারী হবেন। বাস রুট যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস ও সীমিত করা হবে এবং সহজে চেনার জন্য রংভিত্তিক আলাদা বহর চালু করা যেতে পারে। নগদ অর্থের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম) ভাড়া আদায় করার সুযোগ থাকবে। তবে ভাড়া আদায়ে টিকেট দেওয়া বাধ্যতামূলক। সরকারসহ সকল বাস মালিকরা কোম্পানির মালিকানা পাবেন এবং কোম্পানী পরিচালনায় সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে এ কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বর্তমান বাস কোম্পানির মালিকরা দুই বছরের জন্য (২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে) শুল্কমুক্ত বাস আমদানির সুযোগ পাবেন। বর্তমানে যার যে কয়টি বাস আছে, তা প্রতিস্থাপনের জন্য এ সুবিধা ভোগ করবেন।

পক্ষান্তরে, ফ্র্যাঞ্চাইজিং পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া রুটে শুধু নির্ধারিত একটি কোম্পানির বাস চলবে। বাস পরিবহণ সেবা পরিচালনা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ) বিধিমালা, ২০২৩[২০] অনুসরণ করে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়ন সম্ভব। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা, সেবার মান ও ভাড়ার কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করবে ও ফ্রেঞ্চাইজি কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি করবে। প্রাথমিক ভাবে সেবাটি সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চালু হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য শহরে এবং আন্তঃজেলা পর্যায়ে এর পরিধি বিস্তৃত করা যেতে পারে।

এর আগে ২০১৫ সালে প্রথম ঢাকায় বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ঢাকার শতাধিক বাস রুটকে ২২টিতে এবং সহস্রাধিক বাস কোম্পানিকে ৬টিতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়। একই সঙ্গে ফিটনেসবিহীন বাস

সড়ক থেকে তুলে নেওয়া, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল, সিটি বাস টার্মিনাল ও ট্রেনিং একাডেমি তৈরি ও বাসমালিকদের নতুন বাস ক্রয়ে সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে ১৮৫০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়।

২০২৫ সালে ঢাকার পরিবহণ খাত থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পাশাপাশি নগর পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রকল্প" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট–২: পরিবহণ খাত থেকে নির্গমন হ্রাস এর আওতাধীন সাবকম্পোনেন্ট–২.২: বাস আধুনিকায়ন কর্মসূচি এর মাধ্যমে ২০৪০ সালের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইসভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে প্রায় ৪০০টি বৈদ্যুতিক বাস চালু করা হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, অ্যাসেটকো (AssetCo), বাসগুলো ক্রয় করে অপারেটরদের লিজ দিবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যাটারি প্রতিস্থাপন ও ওয়ারেন্টি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। চুক্তি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা এবং যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (ব্যয় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা) চালু করা হবে। যানবাহন ট্র্যাকিং, স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায় ব্যবস্থা, যাত্রী তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা, একটি অপারেশনস কন্ট্রোল সেন্টার, ডাটা সেন্টার এবং একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এই সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অ্যাপটির মাধ্যমে যাত্রীরা সময়সূচি দেখতে পারবেন, টিকিট কিনতে পারবেন, যাত্রার সময় ট্র্যাক করতে পারবেন, মতামত (ফিডব্যাক) জানাতে পারবেন এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ঘটনা রিপোর্ট করতে পারবেন। অর্থায়ন হবে বিশ্ব ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক। পাশাপাশি ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং প্রদানের জন্য একটি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ফান্ড গঠন করা হবে। বাস আধুনিকায়ন কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ২ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা (১৯১.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এর মধ্যে ২ হাজার ১২৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিবে। সরকার নিজস্ব অর্থায়ন করবে ২০৫ কোটি টাকা। এই মডেলটির পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে গণপরিবহণে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সমন্বয় করা যেতে পারে এবং বাসের মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির আওতায় রাখা যেতে পারে। বিকল্প পন্থায় বাস মালিকদের ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সমন্বিত নতুন বাস ক্রয়ে ঋণ ও কর রেয়াত দেয়া হবে।

বিশ্বব্যাংকের এ প্রকল্প নগরাঞ্চলে সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজ করবে। বিশেষতঃ নতুন বাস যুক্ত করার ক্ষেত্রে ঋণ সাহায্য, বাস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা ও অ্যাপের ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির কার্যক্রমগুলো বৃহত্তর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। প্রাথমিকভাবে ২০১৫ সালের প্রকল্প বিবেচনায় এবং বিশ্বব্যাংকের চলমান প্রকল্পের বাইরে পাঁচ বছরের জন্য ২০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে অর্থাৎ প্রতি বছর ব্যয় হবে ৪০০ কোটি টাকা। এই বার্ষিক ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ০.০৫ শতাংশ এবং জিডিপির ০.০০৬ শতাংশ।

নিয়মিত আর্থিক পর্যালোচনার মাধ্যমে উদ্যোগটি যেন টেকসই হয় তা নিশ্চিত করতে পেশাদারী কোম্পানী গঠন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও পরিবহণ মালিকপক্ষ থেকে প্রতিরোধ বাস্তবায়নকে ব্যাহত করতে পারে।

সমন্বিত কর ব্যবস্থা

স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা, জাতীয় উন্নয়নের সোপান

- একটি সেবাকেন্দ্রিক কর ব্যবস্থা- স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিটার্ন পূরণ, যাচাই ও অতিরিক্ত কর ফেরত; ই-পেমেন্ট সুবিধা
- কর ফাঁকি, প্রসাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও কর পরিপালনের ব্যয় কমবে
- সকল সৎ করদাতা (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) সহজ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পাবে, রাজস্ব আহরণ বাড়ার ফলে উন্নয়ন অর্থায়ন বৃদ্ধি পাবে
- বিশ্বব্যংকের ঋণের টাকায় 'সিটা' প্রকল্প পরিমার্জনে বাস্তবায়ন সম্ভর- বার্ষিক ব্যয় গড়ে ৪৫০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.০০৭%)

বাংলাদেশে যেখানে কথিতভাবে উল্লেখযোগ্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, সেখানে রাজস্ব আহরণ কেন এত কম—এই প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট মহলে বারবার উঠে এসেছে। বাস্তবে অনেকক্ষেত্রে করদাতাদের পরিশোধিত করের পূর্ণ অংশ কোষাগারে পৌঁছায় না। কর ফাঁকি সরকারের আর্থিক সক্ষমতা সংকুচিত করছে যা জনগণকে পরিষেবা দেয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে বাঁধা সৃষ্টি করছে। কর প্রশাসন ব্যবস্থাটি আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক—এই তিনটি পৃথক কাঠামোতে খণ্ডিত রয়ে গেছে। এর ফলে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, কর পরিপালনের উচ্চ ব্যয় এবং রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকি তৈরি হয়। ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি এবং সীমিত ই-সেবার কারণে ভুল, বিলম্ব এবং দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ে। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো তৃতীয় পক্ষ ডেটাবেজের সঙ্গে আন্তঃসংযোগের অভাব কর ফাঁকি শনাক্ত করা এবং কার্যকর অডিট পরিচালনা ব্যাহত করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কর ব্যবস্থার সর্বাত্মক আধুনিকায়ন, স্বয়ংক্রিয়করণ ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ২০৩০ অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৬ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব[18]।

কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি একীভূত, স্বয়ংক্রিয় এবং আধুনিক সমন্বিত কর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত সমন্বিত কর ব্যবস্থাপনা দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ কর–সম্পর্কিত কার্যক্রম যেমনঃ কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, পরিশোধ, রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণ, হিসাবরক্ষণ, সম্মতি ব্যবস্থাপনা এবং অডিটকে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একীভূত করবে।

সকল করযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার আওতাধীন হবেন। ব্যাক্তি ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (বিন) ব্যবহার করে একটি ইন্টারফেজ তৈরি করা হবে। প্রতিষ্ঠানের জন্য কাস্টমস, মূসক, আয়কর, ব্যাংক হিসাব, ভূমি, হোল্ডিং নম্বর (ভূমি ও বিল্ডিং), গাড়ির নিবন্ধন নম্বর তথ্যভান্ডারে একত্রিত করা হবে। ব্যাক্তির জন্য আয়কর, ব্যাংক হিসাব (ক্রেডিট কার্ড সহ), ভূমি, হোল্ডিং নম্বর, গাড়ির নিবন্ধন ইত্যাদি তথ্যভান্ডারে যুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে একজন করদাতা যখন তার রিটার্ন তৈরি করবেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ব্যাংক হিসাব এবং সম্পত্তির তথ্য যুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমদানী (কাস্টমস), স্থানীয় ক্রয়-বিক্রয় (মূসক) এবং আয়ের বা লাভের তথ্য (আয়কর) স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হবার ব্যবস্থা হবে।

আধুনিক সার্ভিস–অরিয়েন্টেড আর্কিটেকচারভিত্তিক এই সিস্টেম পুরনো বিচ্ছিন্ন ডেটাবেজগুলোকে প্রতিস্থাপন করে সব কর বিভাগের জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি করবে, যা সিস্টেম–টু–সিস্টেম আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করবে। একটি একক করদাতা পোর্টাল ই–নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)–এর মাধ্যমে সহজ ই–পেমেন্ট সুবিধা দেবে। ব্যাক–অফিস মডিউলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিটার্ন যাচাই, রিয়েল–টাইম হিসাবরক্ষণ, রিফান্ড প্রক্রিয়া এবং আপত্তি ও আপিল নিষ্পত্তির কাজ সম্পন্ন করবে, ফলে এসব কার্যক্রম আগের তুলনায় অনেক দ্রুত, সহজ এবং নির্ভুল হবে।

[18] Rahman, M., & Rozario, I. M. (n.d.). Digitalisation of the Bangladesh tax system: The next frontier for higher resource mobilisation (Working paper).

কর গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য থাকা বিশেষ মডিউল উন্নত অ্যালগরিদম ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে কোন করদাতারা উচ্চ ঝুঁকিতে আছে তা চিহ্নিত করবে এবং ঘোষিত আয়ের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ তথ্য মিলিয়ে অসঙ্গতি শনাক্ত করবে। এতে কর-ফাঁকি ও কর-এড়ানোর সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার নীতি-পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ এবং রিয়েল-টাইম নজরদারিকে আরও শক্তিশালী করবে। পুরো সিস্টেমটি প্রতিটি লেনদেনের ডিজিটাল অডিট ট্রেইল সংরক্ষণ করবে, যা স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কমিয়ে দেবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এনআইডি, কাস্টমস ও ব্যাংকসহ বহিঃসংস্থার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ডেটা-সংযোগ তৈরি হবে, ফলে এনআইডিকে একক রেফারেন্স নম্বর হিসেবে ব্যবহার করে কর-তথ্য মিলানো সহজ হয়ে যাবে।

বাস্তবায়ন ধাপে ধাপে একটি সুপরিকল্পিত রোডম্যাপ অনুসরণ করবে, যাতে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এবং এনবিআরের ভেতরের কর্মপ্রক্রিয়া—দুটিই সময় নিয়ে মানিয়ে নিতে পারে। প্রথম ধাপ শুরু হবে নিবন্ধন ও কর পরিশোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আধুনিকায়নের মাধ্যমে। এ পর্যায়ে পুরনো তথ্যভান্ডার পরিষ্কার করা হবে, একটি একীভূত ই-নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হবে এবং করদাতা অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি হবে। একই সঙ্গে সিস্টেমের মূল প্রযুক্তিগত কাঠামো, সুশাসন ব্যবস্থা এবং সাইবার নিরাপত্তার ভিত্তিও স্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে বৃহৎ করদাতা ইউনিটকে অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ই-রিটার্ন দাখিল ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন চালু করা হবে। ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বিত ই-পেমেন্ট গেটওয়ে চালু হবে, যাতে কর পরিশোধ আরও সহজ ও দ্রুত হয়। এই ধাপেই আয়কর ও ভ্যাটের জন্য একটি যৌথ ডেটা মডেল চূড়ান্ত করা হবে, যা ভবিষ্যতের সব ডেটা ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। শেষ ধাপে ঝুঁকি-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ইঞ্জিন চালু হবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি শনাক্ত করে অডিট ও নজরদারি আরও কার্যকর করবে। পাশাপাশি এনআইডি, কাস্টমস, ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডেটা-সংযোগ স্বয়ংক্রিয় করা হবে। এই ধাপেই কেন্দ্রীয় ডেটা ওয়্যারহাউস ও উন্নত বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম পুরোপুরি কার্যকর হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এনবিআর-এর সাম্প্রতিক তিন বছর মেয়াদী "স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনস ফর ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি (সিটা)" প্রকল্পের আওতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব (১ হাজার ১৯০ কোটি টাকার প্রকল্প, যার মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ)। এতে প্রতি বছর গড়ে ৪৫০ কোটি টাকা দরকার হবে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের ০.০৫ শতাংশ এবং জিডিপির ০.০০৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে এনবিআর-এর প্রকল্পের কার্যক্রমে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের দরকার।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন। আয়কর-ভ্যাট-কাস্টমসের বিচ্ছিন্ন কাঠামো একীভূত করতে আইন, বিধি ও কর্মপ্রক্রিয়ায় সমন্বিত সংস্কার দরকার হবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ধারাবাহিক নীতিগত সমর্থন না থাকলে এমন গভীর সংস্কার দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করা কঠিন হবে। সাইবার নিরাপত্তা, গোপনীয়তা সুরক্ষা, এবং তথ্য আদান প্রদানের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হলে ঝুঁকি বাড়বে। দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, ব্যবহারবান্ধব সেবা, এবং করদাতাদের আস্থা অর্জন না হলে প্রত্যাশিত গ্রহণযোগ্যতা ও পরিপালন নিশ্চিত করা যাবে না।

জাতীয় সমন্বিত তথ্যভান্ডার

সকলের তথ্যে নির্বিঘ্ন নাগরিক সেবা

- নাগরিকের জন্ম মৃত্যু সনদ, পাসপোর্ট, ভোটার তথ্য, প্রবাসী শ্রমিকদের স্মার্টকার্ড, সামাজিক নিরাপত্তা, কৃষি প্রণোদনাসহ সকল সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হবে
- বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ, পরিষেবা প্রদানে চাহিদা নিরূপণ, ডুপ্লিকেশন রোধ ও তথ্য যাচাই সহজ হবে, বাড়বে নাগরিক পরিষেবা এবং রাজস্ব সংগ্রহ
- দেশের সকল নাগরিক উপকারভোগী হবেন
- বাজেটের বরাদ্দে বছরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় (জিডিপির ০.০১%)

বাংলাদেশে প্রশাসনিক ও নাগরিক তথ্য বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত থাকে। ফলে সেবা প্রদান ধীর হয়, ডুপ্লিকেশন বাড়ে এবং লক্ষ্যভিত্তিক সুবিধা বণ্টণে ত্রুটি ঘটে। নাগরিক সেবাকে আরও দক্ষ, নাগরিক-কেন্দ্রিক এবং স্বচ্ছ করে গড়ে তুলতে একটি জাতীয় সমন্বিত তথ্যভান্ডার (ডেটাবেজ) গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমন্বিত তথ্যভান্ডারে প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম সনদ, করের ই-টিন, পাসপোর্ট, ভোটার তথ্য, প্রবাসী শ্রমিকদের স্মার্টকার্ড, সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ সেবাসহ অন্যান্য সকল সরকারি পরিষেবার সুবিধা প্রাপ্তির তথ্যের আন্তঃসংযোগ থাকবে। একই সাথে ভূমি, হোল্ডিং নম্বর, কোম্পানি মালিকানা (ট্রেড লাইসেন্স), ব্যাংক একাউন্ট সহ অন্যান্য তথ্য একত্রিত করা হবে। এর সাথে বিবাহ, তালাক, মৃত্যু সনদ ইত্যাদি তথ্য সংযুক্ত করা হবে। একটি সিভিল রেজিস্ট্রি সব সরকারি সেবার প্রাপ্যতা ও উপকারভোগীর তথ্য সম্বলিত একটি অভিন্ন ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করবে। এই তথ্যভাণ্ডারে একই পরিবারের সকল সদস্য যুক্ত থাকবে যা সরকারি প্রণোদনা বিতরণে অপচয় রোধ করবে।

এই সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্পন্ন করা অপরিহার্য, এবং সে লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগ ইতোমধ্যেই চলমান রয়েছে। যেমন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন, ডেটা সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাইনামিক সোশাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর) স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। খসড়া কৃষক স্মার্ট কার্ড নীতিমালা (কেএসসি) ২০২৫ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সমন্বিত কৃষক ডেটাবেজ তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। করসংক্রান্ত তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর অধীনে বিভিন্ন আলাদা সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যার ফলে করসংক্রান্ত তথ্যভান্ডারের কার্যকর সমন্বয় এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। এই সকল স্বতন্ত্র তথ্যভান্ডার সমন্বিত করেই প্রস্তাবিত সমন্বিত তথ্য ভান্ডার তৈরি হবে।

প্রস্তাবিত উদ্যোগটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে অবকাঠামো ও সফটওয়্যার উন্নয়ন হবে, দ্বিতীয় ধাপে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংযোগ স্থাপন করা হবে, এবং তৃতীয় ধাপে সেবাভিত্তিক সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে সরকার এ প্রকল্পে বছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে এই তথ্যভান্ডার তৈরি করতে পারে। প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন তিন বছরের বছরের মধ্যে করতে হবে। প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণে এর আগের হাউজহোল্ড ডাটাবেজ তৈরির অভিজ্ঞতা আমলে নেওয়া হয়েছে। শুরুতে বিনিয়োগ তুলনামূলক বেশি হলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রশাসনিক ব্যয় কমবে, ভুল ও অপচয় হ্রাস পাবে এবং রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

এই তথ্যভান্ডার বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যভান্ডারের মধ্যে আন্তঃঅভিগম্যতা (inter-operability) যুক্ত করবে। এতে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে ডুপ্লিকেশন ও তথ্য যাচাই সহজ হবে। একই সাথে দেশের যেকোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি প্রণয়নে তা সহায়ক হবে। পূর্বে প্রস্তাবিত নয়টি কর্মসূচির কার্যকরণেও এই উদ্যোগটি সহায়তা করবে।

একটি কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণকারী সংস্থা এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেবে, যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে হতে পারে। কারিগরি পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওপর। সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থা

নির্ধারিত প্রোটোকল অনুসরণ করে তথ্য আদান-প্রদান করবে। তথ্য বিনিময়, প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হবে।

এই উদ্যোগের প্রধান ঝুঁকি হলো তথ্যের নিরাপত্তা। তাই শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিয়মিত নিরাপত্তা নিরীক্ষা প্রয়োজন। গোপনীয়তা লঙ্ঘনের আশঙ্কা কমাতে ডেটা সুরক্ষা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ শক্ত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি এড়াতে উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব, স্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন এবং কার্যকর সমন্বয় কাঠামো জরুরি। নাগরিক আস্থার ঘাটতি কমাতে স্বচ্ছ যোগাযোগ, নিয়মিত তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চ। উপসংহার

এই নাগরিক ইশতেহার কোনো অনমনীয় ঘোষণাপত্র নয়; এটি একটি ক্রমপরিবর্তনশীল জীবন্ত দলিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে এ দলিল নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হবে। সম্ভাবনা ও সুযোগের ভিত্তিতে নির্ধারিত অগ্রাধিকারসমূহের বাস্তবায়নে এককভাবে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক কাজ করা সমমনা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত প্রয়াসে এগিয়ে যেতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই ইশতেহারের প্রত্যাশাগুলো কেবল দাবি উত্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আমরা একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর জবাবদিহিমূলক কাঠামো গড়ে তুলতে চাই এবং তার ওপর নির্ভর করে ধারাবাহিক নজরদারি বজায় রাখতে চাই। এই উদ্দেশ্যে সংস্কার উদ্যোগগুলোর অগ্রগতি নিয়মিতভাবে অনুসরণ, নথিভুক্ত ও মূল্যায়নের জন্য একটি ডিজিটাল ওয়েবভিত্তিক "রিফর্ম ট্র্যাকার"[19] চালু করা হয়েছে। এই ট্র্যাকার-এর মাধ্যমে কেবল অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ নয়, গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নের একটি স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক প্রক্রিয়াও ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা হবে।

একই সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী সমাজ ও অন্যান্য প্রভাবশালী অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনা অব্যাহত রাখবে। গত এক দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে নাগরিক সমাজের দাবি ও প্রত্যাশার পক্ষে সচেতন, সক্রিয় ও সোচ্চার অবস্থান ধরে রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ ও অংশীজনরা এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনের পথে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাব।

[19] https://reformtracker.bdplatform4sdgs.net/

ছ। পরিশিষ্ট

১। জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কিত

নাগরিক প্রত্যাশার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়সংবেদনশীল অংশ হলো জাতীয় নির্বাচন। আঞ্চলিক পরামর্শ সভা ও অনলাইন মতামত সংগ্রহকালীন সময়ে নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচনকে ঘিরে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মূল প্রত্যাশা হলো—ভীতিমুক্ত পরিবেশে বিশ্বাসযোগ্য ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, যাতে জনগণ নির্বিঘ্নে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। উপর্যুক্ত দশটি জাতীয় ডোমেইনের বাস্তবায়নের একটি মৌলিক পূর্বশর্ত হিসেবে নাগরিকরা একটি বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ব্যবস্থাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অর্থবহ নির্বাচনের জন্য নাগরিকরা যে বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন, তা চিত্র ৩-এ উপস্থাপন করা হলো। এটি একটি সমন্বিত চিত্র।

চিত্র ৩: নির্বাচন সম্পর্কিত নাগরিক চিন্তা

সূত্র: পাঁচটি আঞ্চলিক পরামর্শ সভার সমন্বিত ওয়ার্ড ক্লাউডের ভিত্তিতে

এ প্রেক্ষিতে, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নাগরিকদের যে সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা ও দাবি উঠে এসেছে তা এখানে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

১) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা শুধুমাত্র কাগজে নয় বাস্তবে নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা শক্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২) মনোনয়ন বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে এবং অবৈধ অর্থ, কালোটাকা ও ভোট কেনাবেচার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) দুর্নীতি বা ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রার্থী করলে নির্বাচন কমিশনের মনোনয়ন বাতিলের ক্ষমতা কার্যকরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্ধারিত জামানতের পরিমাণ—বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা—পুনর্বিবেচনা ও হ্রাস করতে হবে, কারণ এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথে অন্তরায়।

৫) নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক অনুদান ও প্রার্থীদের ব্যয়ের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬) 'না ভোট' বা বিকল্প মত প্রকাশের অধিকার পুনর্বহাল ও কার্যকর করতে হবে এবং ভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের ভোটাধিকারের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে হবে।

৭) ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও সংশোধনের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সময়সূচি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার তথ্য সহজে সবার নাগালে পৌঁছে দিতে হবে।

৮) প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯) নির্বাচনের পূর্বে সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সর্বপ্রকার প্রশাসনিক সহায়তা দিতে হবে।

১০) নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে; প্রার্থীর পরিচয় বা দলীয় অবস্থান দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে—আচরণ বিধিলঙ্ঘন ও আইনভঙ্গ করা হলে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১) নির্বাচনে সহিংসতা, ভয়ভীতি, হুমকি, সন্ত্রাস ও ভোটকেন্দ্র দখলের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে, এবং দায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্র সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্ত রাখতে হবে।

১৩) নারী, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক ও সহায়ক ভোটপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪) ভোটার যদি জানতে পারেন যে তার ভোট অন্য কেউ প্রদান করেছে, তাহলে সেই ভোট বাতিল করে যাচাই-সাপেক্ষে পুনরায় ভোট দেওয়ার একটি নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৫) মনোনয়নপত্র যাচাই, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও ফল ঘোষণাসহ নির্বাচনের প্রতিটি ধাপে সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ, সমান আচরণ ও নিরপেক্ষ প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬) প্রযুক্তির নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং ভোটার তালিকা, ফল গণনা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে, যাতে প্রযুক্তির কারণে আস্থার সংকট সৃষ্টি না হয়।

১৭) নির্বাচন পরবর্তী কয়েকদিন নির্বাচনজনিত কারণে যাতে কেউ ভয়-ভীতি ও সহিংসতার শিকার না হন তার নিশ্চয়তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৮) 'আঞ্চলিক' রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন সহজ করতে নিবন্ধনবিধি শিথিল করতে হবে।

সার্বিকভাবে, নির্বাচন কমিশনের প্রতি নাগরিকদের প্রত্যাশা একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা—যেখানে সকল ভোটার নিরাপদে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এসব দাবি কেবল একটি নির্বাচনের নয়; এগুলো একটি বিশ্বাসযোগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

এই নির্বাচনী প্রত্যাশাগুলো 'নাগরিক প্রত্যাশা' অংশে উল্লিখিত দশটি ডোমেইনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। নাগরিকরা মনে করেন, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন ছাড়া সুশাসন, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহ্রাস ও টেকসই উন্নয়ন—কোনোটিই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

২। আঞ্চলিক পরামর্শসভাসমূহের তালিকা

i. সিলেট আঞ্চলিক পরামর্শসভা — বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
ii. রাজশাহী আঞ্চলিক পরামর্শসভা — শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
iii. বরিশাল আঞ্চলিক পরামর্শসভা — বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫
iv. খুলনা আঞ্চলিক পরামর্শসভা — বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫
v. ময়মনসিংহ আঞ্চলিক পরামর্শসভা — সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
vi. রংপুর আঞ্চলিক পরামর্শসভা — শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
vii. চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরামর্শসভা — বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
viii. রাঙামাটি আঞ্চলিক পরামর্শসভা — বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

৩। যুব কর্মশালার তালিকা

i. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
ii. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
iii. আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ(এআইইউবি)যুব কর্মশালা — বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
iv. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — রবিবার, ২ নভেম্বর ২০২৫
v. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — সোমবার, ৩ নভেম্বর ২০২৫
vi. ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — বুধবার, ৫ নভেম্বর ২০২৫
vii. ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) যুব কর্মশালা — বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর ২০২৫
viii. নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ix. নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যুব কর্মশালা — শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
x. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫
xi. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫
xii. ইয়ুথ পলিসি ফোরাম আয়োজিত যুব কর্মশালা — শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
xiii. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
xiv. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — মঙ্গলবার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫
xv. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যুব কর্মশালা — মঙ্গলবার, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫

নাগরিক ইশতেহার ২০২৬
জাতীয় নির্বাচন ও রূপান্তরের প্রত্যাশা

বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের রাষ্ট্রচিন্তা, ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক অভীপ্সা এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান একসঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণকে অর্থবহ করে তুলতে হলে রাষ্ট্র ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে নাগরিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে দৃশ্যমান ও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা অপরিহার্য।

এই উপলব্ধি থেকেই প্রণীত হয়েছে নাগরিক ইশতেহার— যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় তৃণমূল থেকে উঠে আসা মানুষের অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ ও পরিবর্তনের প্রত্যয়কে একত্র করেছে। এটি কোনো চূড়ান্ত বা অনমনীয় ঘোষণাপত্র নয়; বরং জনগণের সমষ্টিগত দরকষাকষির একটি হাতিয়ার।

নাগরিক ইশতেহার একটি ক্রমপরিবর্তনশীল জীবন্ত দলিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনের আলোকে এটি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হবে, যাতে নাগরিকদের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রচিন্তার ধারাবাহিক প্রতিফলন বজায় থাকে।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ
সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/ সি, রোড ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২১৭৮০-২
ইমেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net
ওয়েবসাইট: www.bdplatform4sdgs.net